# আমার কাল আমার চিন্তা
## (বিদেশ সফর)
## শাহ আবদুল হান্নান

**প্রথম বিদেশ সফর**

১৯৫৭ সাল। তখনও আমি ছাত্র। সেই সময়ই আমি প্রথম দেশের বাহিরে যাই। ইসলামী ছাত্রসংঘের একটা ডেলিগেশন ঢাকা থেকে করাচী যাচ্ছিল। পনের সদস্যের সেই দলে আমিও ছিলাম। একটা ছাত্র সংগঠনের পক্ষে সেই সময় এতজনের বিমান টিকিট সংগ্রহ করা কষ্টকরই ছিল। খরচ বাঁচাতে সে জন্যে আমরা ট্রেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। ঢাকা থেকে আমরা ট্রেনে করে কলকাতা গিয়ে পৌঁছালাম। সিরাজগঞ্জে ট্রেন বদল করতে হয়। কলকাতাতে দু'দিন ছিলাম। খরচের কথা চিন্তা করে আমরা মুসাফিরখানায় থাকলাম। নিজেদের সামান্য কিছু বিছানাপত্র ছিল। সবাই মিলে সেখানে একত্রে ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া শুধু পাশের যাকারিয়া স্ট্রিটের হোটেলে করতাম। পরে হাওড়া থেকে ট্রেনে করে অমৃত শহর পৌঁছলাম। এটাই আমার প্রথম ভারত সফর এবং সেই সাথে প্রথম বিদেশ সফরও। নিজের দেশের বাহিরে এই প্রথম বের হলাম।

আমরা মনে করেছিলাম জায়গা পেতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে ইঞ্জিনের সাথে লাগানো বগিতে। মানুষ নানা কারণে ইঞ্জিনের সঙ্গের বগিতে উঠতে চায় না। কিন্তু আমাদের চিন্তা ছিল আমরা যদি সেই বগিতে যাই তাহলে জায়গার সুবিধা হবে; হায়াত-মওত তো আল্লাহর হাতে। অমৃত শহর থেকে আমরা ওয়াগা-আত্তারি বর্ডার বলে এক সীমান্তে পৌঁছলাম। সেখানে ইন্ডিয়ান কাস্টমস চেকিং হলো। তারা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহারই করল। আমার মনে আছে, আমার সাথে কুরআন শরীফ ছিল তারা সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তছাড়া খুব একটা ভালো ব্যবহার পেলাম না। সেই সময় পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কও খুব একটা ভালো ছিল না। বাংলাদেশের সাথে আজকের দিনের সম্পর্ক সেই সময়ের তুলনায় বেশ ভালো বলা যায়। সেখান থেকে আমরা লাহোর গেলাম। লাহোরে আমরা দেড়দিনের মতো ছিলাম। সেখানে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। জামায়াতে ইসলামীর সদর দপ্তরে ভিজিট করলাম। জামায়াতে ইসলামীর ইচড়াস্থিত অফিসে গিয়ে আমি অবাক হলাম, দেখলাম খুবই ছিমছাম একটা অফিস। অত্যন্ত সুন্দর ছোট অফিস। তখন জামায়াতে ইসলামী অফিস আজকের মতো এত বড় ছিল না এখন যেমন লাহোরের মনসুরাতে হয়েছে। সেখানেই ইচড়া অফিসে আমরা মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করি। অতঃপর সেখান থেকে করাচী গেলাম।

সম্মেলনটি ছিল অল পাকিস্তান ছাত্রসংঘের, করাচীতে। অর্থাৎ ইসলামী জমিয়তে তালাবা পাকিস্তানের বার্ষিক সম্মেলন। সিন্দ মাদ্রাসা গ্রাউন্ডে সম্মেলন হয়। সিন্দ মাদ্রাসা বলা হলেও সেটা আসলে কলেজ। ওই সময়ের একটা বড় কলেজ ছিল। কলেজের মাঠও ছিল অনেক বড়। সেখানেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পরও আমরা করাচী শহরে কয়েকদিন ছিলাম। করাচী শহর দেখি। করাচী বিচ দেখতে যাই। সেটাও প্রথম বারের মতো। করাচী শহরের একটা বিখ্যাত জায়গা হলো 'গান্ধী গার্ডেন'। পাকিস্তান হবার পরেও তারা গান্ধী গার্ডেন নামটি পরিবর্তন করেনি। কিন্তু আমাদের দেশে যেটা দেখা যায় খুব সহজেই আমরা নাম পরিবর্তন করে ফেলি। আমি যতটুকু জানি বোম্বেতে এখনো 'এম এ জিন্নাহ' রোডের নাম অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

সম্মেলন শেষে আমরা আবার করাচী থেকে লাহোরে ফিরে আসি। লাহোরে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখি। সালামার গার্ডেন, ইকবালের মাজার, বাদশাহী মসজিদ, মোঘল কেল্লাগুলো দেখি। সেখানে আমরা জাহাঙ্গীরের কবরস্থান যাকে 'মকবেরা জাহাঙ্গীর' বলে - সেটা আমরা দেখি। এরই মধ্যে আমরা সেই সময় পাকিস্তানের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত মওলানা আমিন আহমদ ইসলাহী সাহেব সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি পরবর্তীতে একটা বিখ্যাত তাফসীর লেখেন 'তাদাব্বুরে কুরআন' নামে। তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তার সঙ্গে কথা বলে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারি। সে সময় কাদিয়ানীদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি আমাদের বলেছিলেন, তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত দলিলভিত্তিক বই লেখার প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে এর উপর একটি

বই মওলানা আবুল হাসান নদভী লেখেন 'কাদিয়ানাত' নামে আরবিতে। সেটা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা সেই একই পথে ঢাকায় ফিরে আসলাম। আমাদের মধ্যে ছিলেন ইসলামী ছাত্র সংঘের বাংলাদেশ অংশের তৎকালীন সভাপতি সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী সাহেব, যিনি আমার ক্লাসমেটও ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিলের সেক্রেটারি হয়েছিলেন। তিনি আমাদের দলের দলনেতা ছিলেন। উপনেতা ছিলেন জনাব আখতার ফারুক সাহেব। তিনি তখন শর্ষীনা মাদ্রাসাতে পড়তেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। আমি ছাড়াও ছিলেন প্রফেসর রফিকউদ্দিন আহমদ। তিনি বাংলা সাহিত্যের ভালো ছাত্র ছিলেন, শিক্ষক ছিলেন। অন্যদের কথা এই মুহূর্তে আর মনে পড়ছে না। আমার এই সফর ছিল দেশের বাইরে ছাত্রজীবনেরও প্রথম সফর।

**তুরস্ক ও ইরান সফর**

এরপর লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে প্রবেশ করলাম। চাকরি জীবনের প্রথম সফর হলো ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে। তখন Central Treaty Organization (CENTO) নামে একটি সংস্থা ছিল। বাংলাদেশ অংশ থেকে আমরা দু'জন এবং পাকিস্তান অংশ থেকে দু'জন সহ মোট চারজন সেই সংস্থার আমন্ত্রণে ইরান ও তুরস্ক গিয়েছিলাম। স্মাগলিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ের উপরে একটি ট্রেনিং কোর্সে অংশ নিতে যাই। আমি রওনা হয়ে করাচী পৌঁছলাম। সেখানে কয়েক ঘন্টা সময় হাতে ছিল। বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা অফিসার জনাব নূর মোহাম্মদ আকন্দ সাহেব, পরবর্তীতে তিনি Director General of Post Office হয়েছিলেন, করাচীতে থাকতেন। তখন তিনি খুব সম্ভব ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল হিসাবে পাকিস্তানে ছিলেন। হাতে কিছু সময় থাকাতে তার সাথে দেখা করতে আমি তার বাসায় যাই। তিনি দেখলেন যে, আমি শীতের কাপড় তেমন সঙ্গে নিয়ে যাইনি। তিনি যেহেতু অনেক ভ্রমণ করেছেন, তিনি জানতেন সেখানে অনেক শীত হবে। তাই তিনি তার কিছু শীতের কাপড় আমার সঙ্গে দিয়ে দেন। আমি এয়ারপোর্ট থেকেই সরাসরি তার বাসায় চলে গিয়েছিলাম। তিনি নিজেই আবার আমাকে এয়ারপোর্টে দিয়ে যান। এয়ারপোর্টেই আমরা চারজন সফরসঙ্গী একত্রিত হলাম।

বাগদাদ হয়ে খুব সম্ভব ৬ই নভেম্বর আমরা ইস্তাম্বুল পৌঁছলাম। বাগদাদে এক ঘন্টা স্টপ ওভার থাকায় বের হতে পারিনি। শুধু আকাশ থেকেই শহর দেখতে হয়েছি। রাত ছিল, তাই কিইবা আর দেখা যায় যে বাগদাদে এখন কত ঘটনাই ঘটে গেল।

ইস্তাম্বুল শহরে নেমেই, মনে পড়ে আমি একটা তুর্কী পত্রিকা নিলাম। সেটাতে বিরাট হেডিং ছিল 'Nixon Olde Hamfrey Ilarde' - আগের দিন অর্থাৎ ৫ই নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে গেছে। সেটা তারই ফলাফলের খবর। বিষয়টা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পত্রিকার সেই বিরাট 'হেডিং নিক্সন ওলদে' মানে হলো নিক্সন জয়লাভ করেছে এবং 'হামফ্রে ইলারদে' হলো হামফ্রে পরাজিত হয়েছে। আট কলাম হেডিং ছিল। ভিতরে তুর্কি ভাষায় ছাপা ছিল - যার কিছুই বুঝি না। ওদের ভাষা তুর্কী হলেও স্ক্রিপ্ট ইংরেজিতে থাকায় ভাসাভাসা বোঝার চেষ্টা করি।

সেখান থেকে প্লেন পাল্টিয়ে তার্কিশ হাওয়া ইললোরী (Tarkish Hawa Illori - THY) অর্থাৎ তার্কিশ এয়ার লাইন্সের প্লেনে করে আমরা রাজধানী আঙ্কারা পৌঁছালাম। আমরা তুরস্কে ছিলাম তিন সপ্তাহ। তুরস্কে অবস্থানকালে আমরা তাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গেলাম। কেননা এটা ছিল স্মাগলিং বিষয়ক ট্রেনিং। তাদের একটা ডিফেন্স ফোর্স হলো 'জান্দারমা' - এটা আমাদের বিডিআর-এর মতো। আমরা তাদের হেডকোয়ার্টারে গেলাম। যারা নারকোটিকস নিয়ে কাজ করে তাদের হেড কোয়ার্টারে গেলাম। কাস্টমস ডিপার্টমেন্টে গেলাম। তাদের কোর্টে গিয়ে বিচার পদ্ধতি, জেলে গিয়ে জেল ব্যবস্থা আর মাদক হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখলাম। তুরস্কে যাওয়ার আগে বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের কিছু নাম ঠিকানা আমি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের সাথে আমি দেখা করি। সেই সব নাম আমার আজ মনে নেই। সেখানকার এক ডেইলি পত্রিকার তরুন সম্পাদক আমার হোটেলে আসলেন। তার নাম ছিল মুস্তাফা বিলগে। তখনই আমি লক্ষ্য করেছিলাম তুরস্কে, ইসলাম জাগ্রত হচ্ছে। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষার

নামে তুরস্কে ইসলামকে দমিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামের চর্চার অবকাশ কম যা ইংল্যান্ডে কিংবা আমেরিকাতে নেই। এমন ধরনের অদ্ভুত কঠোর সেকুলারিজম সেখানে আছে। সেখানে অফিসে, স্কুল-কলেজে মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ পড়তেও দেওয়া হয় না সেকুলারিজমের নামে।

তুরস্কে অবস্থানকালে সেখানে আমরা বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখলাম। ওসমানী খেলাফতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান দেখলাম। তাদের বিভিন্ন প্যালেন্সসহ নিদর্শনগুলো দেখে বুঝতে পারলাম তাদের কত বিশাল একটা রাষ্ট্র ছিল। তাদের কত প্রাধান্য ছিল ইউরোপ এবং এশিয়ার উপরে তাও তাতে বোঝা যায়। এর মধ্যই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। মারমারা সি'তে আমাদের একটা ট্রাভেলে করে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা ছোট একটা স্পিড বোর্টের মতো বোটে উঠেছিলাম। এক পর্যায় তাতে আগুন ধরে গেল এবং বোর্টটি ডুবতে লাগল। নিশ্চিত মৃত্যুই বলতে হয়। আমরা তীর থেকে দেড় দুই মাইল দূরে ছিলাম এবং ভাগ্যক্রমে আমাদের চারপাশে কিছু নৌকা ছিল। তখনও আমরা কেইউ বাঁচার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দেইনি। এরই মধ্যে চারপাশ থেকে নৌকা এস আমাদেরকে উদ্ধার করে। সে যাত্রা বেঁচেই গেলাম। সাগর তীরেই আমরা দুপুরের লাঞ্চ করছিলাম। আমাদের সাথে ইরানের এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ছিলেন। ইরান টীমের হয়ে তিনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তুর্কি ভাষায় মাছকে 'বালিক' বলে। দুপুরের খাবার খেতে খেতে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হান্নান সাহেব, আমরা এখন বালিক খাচ্ছি, কিন্তু যদি ডুবে যেতাম তাহলে বালিকই আমাদের খেত।' এটা আমার কাছে একটা স্মরণীয় ঘটনা এবং তা এখনো মনে পড়ে।

সেখান থেকে প্রায় তিনশ মাইল দূরে জামালুদ্দীন রুমীর মাজার দেখতে আমরা কোনিয়া গেলাম। তুরস্কের রাস্তাঘাট সে সময়ই খুব ভালো ছিল। সুন্দর এবং পরিকল্পিত রাস্তা বলেই মনে হলো। কোনিয়াতে কিছু হিজাব পড়া মেয়ে দেখলাম। আজকে যেখানে আমরা জানতে পারছি তুরস্কের রুরাল এরিয়ায় প্রায় ৭০-৮০ ভাগ মেয়েই হিজাব পড়ে এবং শহরে সেখানে প্রায় চল্লিশভাগ মেয়ে হিজাব পড়ে। এটা এজন্য নয় যে তারা হিজাব পড়ে না বা পছন্দ করে না। এটা এ জন্যে যে তুর্কী সরকারের ও তার নীতিমালার কারণে তাদের একটা বিরাট অংশ হিজাব পড়তে পারেনি। কিন্তু তারা তখনও হিজাব পছন্দ করত। সে সময় কামাল আতাতুর্কের জন্ম কি মৃত্যু দিবস পড়ে গেল। আমরা তাদের সরকারী অনুষ্ঠানেও গিয়েছিলাম।

আঙ্কারা, ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম শেষ হলে আমরা যাব ইরানে। ইরান যাবার পথে নিজেদের খরচে আমরা দু'তিন দিন বৈরুত থাকলাম। টিকিট ও প্রোগ্রামে একটু পরিবর্তন এনে আমাদের গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিল যে তারা বৈরুত থাকবে। আমরা নিজেরাই সাগরের সম্মুখে একটা ছোট হোটেল ঠিক করে নিলাম। পরবর্তীতে ২০০১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর আবার বৈরুত যাই। সেই সময়টাও নভেম্বরের সময়েই ছিল। সেখান থেকে সাগরের তীরে বেড়াতে যেতাম। শেষবারও আমরা সি ফ্রন্টের আশেপাশেই ছিলাম। সেখানে কিছু জিনিস কিনতে গিয়ে আমরা এক প্রতারকের পাল্লায় পড়েছিলাম। বৈরুত বড় শহর। বৈরুত কম বেশি দুইভাগে বিভক্ত - মুসলমান ও খৃস্টান দুই অংশ। তবে প্রতারকের পাল্লায় পড়েও বেঁচেই গেলাম। আমার এক বন্ধু সেখানে কোট কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু কোট কিনতে গিয়ে এক লোক ডেকে আমাদের এক বাজারের এমন এক সংকীর্ণ স্থানে নিয়ে গেল সেখানে আমরা ভয়ই পেয়ে গেলাম। তবে আমাদের শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি হয়নি।

বৈরুতে থাকতেই রোজা শুরু হয়েছিল। ইরান পৌছালাম। আমি রোজা ভেঙে ফেলাম। কারণ ভ্রমণে আমার পক্ষে রোজা রাখা খুব কষ্টকর ছিল। শারীরিকভাবেও আমি দুর্বল ছিলাম। কেউ কেউ রোজা রাখলেন। মনে আছে সকালে নাস্তা করার জন্য আমি শহরে দোকান খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু নাস্তার কোনো দোকান খুঁজে পেলাম না। সব বন্ধ। তারা আমাকে এক রকম তাড়িয়ে দিল। ১৯৬৮ সাল। ইরানে শাহের আমল। তা সত্ত্বেও ইরানী জনগণের অধিকাংশের ইসলামী বিশ্বাস লক্ষ্য করলাম, Iranian Society at the heart of heart was very strongly Islamic.

আমাদের ট্রেনিং তুরস্কের মতোই হলো। কাস্টমস, পুলিশ, জান্দারমা (বিডিআর), এন্ট্রি স্মাগলিং ডিপার্টমেন্ট, নারকোটিকস ডিপার্টমেন্ট, জেল, কোর্ট-এগুলোতে আমরা প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে গেলাম। ইরানের জেলের একটা ঘটনা আমাকে এখনো খুব পীড়া দেয়। আমরা জেলে গিয়ে সেখানে দেখলাম পাকিস্তানে এক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বন্দী হয়ে আছেন। তিনি আমাদের দেখে চিৎকার করে বলতে লাগলেন Please, help us, please, help us

- আমি বিনা দোষে এখানে আটকা আছি। আমি সহ কেউ কেউ তার দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। তার কথ শুনতে চাইলাম। কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ তা শুনতে দিল না। হয়ত আমাদের এই ঘটনার পরে তার উপর আবার অত্যাচারও হয়ে থাকতে পারে। হতে পারে কোনো কারণে তিনি ইরানে গিয়েছেন । ভ্রমণ বা মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে এরকম বিপদে পড়ে যান। সে সময় আমাদের প্রতি তার যে ধরনের আবেদন ছিল তাতে আমি নিশ্চিত যে তিনি নির্দোষ ছিলেন। এটা এখনো আমার মন বলে। কিন্তু আমি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না।

ইরানের যে সমস্ত অফিসার ছিল তাদের সঙ্গে তুরস্কেই আমাদের সাথে পরিচয় হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন যুবক ছিল তার সাথে তুরস্কের একুশ দিনের অবস্থান হওয়ায় খাতিরও হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে তার বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। তার মা ও পরিবারের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। তার বাসায় কয়েকবারই খাওয়ালো। তার যারা বান্ধবী ছিল তাদের বাসায় নিয়ে গেল। বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

সেখানে যেটা লক্ষ্য করলাম, ঘরের ভিতরও তারা সালোয়ার কামিজ পড়ে। বয়স্ক মেয়েরা সব লম্বা চাদর পড়ে। কিন্তু কিছু মহিলার সাথে দেখা হলো তারা বিদেশী কর্তৃত্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা শেখে বা পড়াশুনা কও়ে, তারা আধুনিক দেখলাম। আর তাদের নৈতিকতাও ভালো নয়। তাদের সবার সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলাম সেখানে তখনই শাহের বিরুদ্ধে একটা গোপন আন্দোলন চলছে। সেটা ছিল সোসালিস্ট ধরনের। আমাকে যারা নিয়ে গেল মনে হলো তাদেরও সোসালিস্ট অনুপ্রেরণা ছিল। আমার সেই বন্ধু Para Military Force এর মেজর পদের ছিল। সেও ওই আন্দোলনের সমর্থক ছিল। যদিও তা বাইরের কেউ তেমন বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমি বেশি মেশার ফলে বুঝতে পেরেছিলাম। আর সেও আমাকে এরকম বলেছিল যে, এখানে ইসলাম ও সোসালিস্টেদের শক্তিশালী কাজ রয়েছে এবং তারা কমবেশি তাদের কাজের সমন্বয় করছে।

ইরানে থাকতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ফলে অন্যরা ইস্পাহান ও শিরাজে গিয়েছিল। আমি সেখানে না গিয়ে হোটেল থেকে গেলাম। তেহরানেই ঘোরাফেরা করলাম। তখন ইরানকে উন্নত দেশ বলেই মনে হলো। যদিও রুরাল ইরান বা ইরানের পল্লী অবস্থা তখনো দেখিনি।

**জাপান সফর**

বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৭৭ সালে প্রথম বিদেশ সফর করি জাপানে। তখন আমি এনবিআর-এর ফার্স্ট সেক্রেটারি। একটি ট্যাক্স ট্রেনিং প্রোগ্রামে জাপান গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে ব্যাংকক গেলাম থাই এয়ারলাইন্সে। সেখান থেকে জাপান এয়ারলাইন্সে করে জাপান পৌঁছাই। থাইল্যান্ডে একদিন বিরতি ছিল। আমার এখনো মনে পড়ে যখন টোকিও বিমান বন্দরে আমাদের প্লেন স্পর্শ করল তার টাচ ডাইন এতো নিখুঁত ছিল যে বিমানটির অবতরণ সম্পর্কে কিছুই বোঝা গেল না।

জাপানে আমাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল 'জাইকা' (Japan International Corporation Agency) নামে একটি সংগঠন। তাদের একটা হোস্টেল আছে টোকিও ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার নামে, সেখানে আমাদের রাখা হয়েছিল। তবে আমরা কয়েকজন ছিলাম সিবুইয়া সানরুট হোটেলে। আমাদের মূল ট্রেনিং হয়েছিল মিতসুই বিল্ডিংয়ে। আমরা ট্রেনিং উপলক্ষে জাপানের মিনিস্ট্রি অব ফাইন্যান্স, মিনিস্ট্রি অব ফরেন ট্রেড প্রভৃতি ভিজিট করি। ট্রেনিং ছিল একুশ দিনের মতো। প্রায় বিশটি দেশ থেকে অংশগ্রহণকারী এসে এতে শরিক হয়। বাংলাদেশ থেকে আমি ও ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের আবদুর রহমান খান সাহেব (যিনি পরবর্তীতে ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার হন) অংশগ্রহণ করি। অন্যান্য দেশের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ ছিল। সিরিয়ান, আফগান, ইরানীয়ান লোকেরাও ছিল।

জাপানে মি. হোসেন খান নামে আমার এক পুরাতন বন্ধু থাকতেন । তিনি পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি ছিলেন। এক সময় ঢাকায় থাকতেন। ঢাকায় তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে প্রায় চার বছরের মতো ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংকে মাস্টার্স ডিগ্রীও অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি জাপান চলে যান। জাপান গিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করি এবং সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে জাপানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। তাতে আমি লক্ষ্য করলাম জাপানে ইসলামের কাজের মোটামুটি অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু ব্যাপকতা তাতে আসছে না। টোকিও ইসলামিক সেন্টার

ভিজিট করি। সেখানে সুদানী এক ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়, তিনি পরে টোকিওতে সুদানী এ্যামবাসিডর হয়েছিলেন। তিনি বর্তমান সুদানের ইসলামী আন্দোলনের লোক। সেখানে অবস্থানকালে জাপানী ইসলামী স্কলারদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। পাকিস্তান ও ভারত থেকে যাওয়া স্কলারদের সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়।

টোকিও ইসলামিক সেন্টার খুব সুন্দর একটা লোকেশনে অবস্থিত। তাদের একটা ভালো লাইব্রেরি আছে এবং ভালো প্রকাশনা আছে। তাদের কাজগুলো মোটামুটি সিস্টেমিক বলেই আমার ধারণা হলো। মনে পড়ে টোকিওর বড় ও বিখ্যাত যে মসজিদটি সেখানে আমরা ঈদের নামাজ পড়ি। প্রায় দু'হাজার মুসল্লির সমাবেশ হয়। সেই নামাজে ইমামতি করেছিলেন সেই মসজিদেরই একজন তার্কিস ইমাম। সোভিয়েত দখলের পর সেন্ট্রাল এশিয়ার তুর্কি ভাষি কিছু মুসলিম জাপানে অভিবাসিত হয়। তারাই জাপানে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে আরবরাসহ উপমহাদেশের মুসলমানরা সেখানে যায়। কিন্তু টোকিও মসজিদের প্রধান নিয়ন্ত্রণ তুর্কিদের হাতেই রয়ে গেছে এবং তারাই তুরস্ক থেকে ইমাম নিয়ে আসেন। পত্রিকায় দেখেছি বর্তমানে সেই মসজিদটি ভেঙে আরো বড় করা হয়েছে।

কিন্তু জাপানে ইসলামের প্রতি গভীর আগ্রহ আছে বলে বুঝতে পারলাম না। এর কোনো কারণও বুঝতে পারিনি। ইরানী বিপ্লবের পর বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমিও সেই সময় জাপান যাই। যদিও হাজার পঞ্চাশেক লোক সেই সময়ের পর ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু তারপরেও ইসলামের দিকে দলে দলে আসার যে প্রবণতা পাশ্চাত্যে রয়েছে সেটা আমি সেখানে লক্ষ্য করিনি। এটার কারণ কি তাও বলা আমার পক্ষে মুশকিল। তারা কি খুব বস্তুবাদী হয়ে গেছে নাকি তারা কোনো আধ্যাত্মিক শূন্যতা বা স্পিরিচুয়াল ভ্যাকুউয়াম অনুভব করেছে না - এটা একটি স্টাডির বিষয়, বিবেচনার বিষয়।

পশ্চিমেরাও তো বস্তুবাদী সভ্যতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ভিতর থেকে অনেক বেশি সংখ্যক পুরুষ এবং নারী, বিশেষ করে নারীরা বেশি সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করছে। সেটা কালোদের মধ্যে যেমন হচ্ছে, সাদাদের মধ্যেও হচ্ছে। যদিও বর্তমানে জাপান বস্তুবাদী সভ্যতার অংশ হয়ে গেছে, ইউরোপ আমেরিকার মতো না হলেও, তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু ১৯৭৭ সালের মতো বর্তমানেও  জাপানীদের উল্লেখযোগ্যভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়া আমরা লক্ষ্য করছি না। এটাও একটা গভীর বিবেচনার বিষয়।

জাপানীদের ধর্ম বৌদ্ধ ও সিন্টোর মিশ্রণ বলেই মনে হলো। বহু লোক একই সঙ্গে বৌদ্ধ এবং একই সঙ্গে সিন্টু। তাদের ধর্ম কোনো রিভিল রিলিজিয়ান - খৃস্টানিটি, ইসলাম বা জুডাইজমের মতো নয়। তাদেরটা একটু পৃথক ধরনের। আমার কেন জানি মনে হলো তাদের ধর্মের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। ইসলামে যেমন সুস্পষ্ট আকীদা আছে, সেখানে তাদের ধর্মে সেরকম আকীদা আছে বলে মনে হলো না। তাদের ধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্মের চেয়ে কালচার নির্ভর বলেই আমার মনে হলো। আরো লক্ষ্য করলাম, পশ্চিমাকরণ সেখানে খুব গভীর হচ্ছে। ট্রাডিশনাল লাইফ ক্রমেই পশ্চিমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সে তুলনায় আরব বিশ্বে, উত্তর আফ্রিকায় বা মুসলিম বিশ্বে, এমনকি বাংলাদেশেও সে রকম পশ্চিমাকরণ ঘটেনি। জাপানীরা আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে আনবিক বোমার মোকাবিলা করেছে। তাতে বহু লোক নিহত হয়েছে। তারপরও লক্ষ্য করলাম তারা সেই পাশ্চাত্যেরই অনুকরণে চলে এবং তাদেরই জীবনাচার তারা গ্রহণ করছে।

জাপানের শহরগুলো অনেক পরিকল্পিত বলেই মনে হলো। টোকিও থেকে কোবে, ইকোহামা, কিয়োটা গেলাম। বুলেট ট্রেনে সফর করলাম। তাতে একটি পরিকল্পিত শহর ও সমাজ লক্ষ্য করলাম। উন্নয়ন সে সময়েই হয়েছে আর সে উন্নয়ন বর্তমানে আরো ব্যাপক। কৃষির ক্ষেত্রে মনে হলো একটি উন্নত কৃষি ব্যবস্থা তাদের রয়েছে। তারপরও শিল্পের প্রতি তারা জোর দিয়েছে বেশি। অনেকটা আমেরিকার মতো জাপান একই সঙ্গে শিল্প ও কৃষিতে উন্নত হয়েছে।

জাপানে একটি জিনিস আমাকে অবাক করেছিল। টোকিওর কেন্দ্রীয় রেল স্টেশন ছিল সিনজুকু। সেখান হয়েই আমাদেরকে মিতসুই বিল্ডিংয়ে প্রতিদিনই যেতে হতো। তারই আশপাশে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে সাব-কন্টিনেন্টের খাবার খেতাম। কিন্তু একদিন আমি লক্ষ্য করলাম, সেই সিনজুক রেল স্টেশনে একজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এবং তার পাশ দিয়ে হাজার হাজার লোক চলে যাচ্ছে। অথচ কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না। আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম, এটা কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যেখানে পুলিশ বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থার কোনো লোক না আসা পর্যন্ত কেউ

তাকে ধরবে না। আমার চোখের সামনে দিয়েই কমপক্ষে পনের হাজার লোক চলে গেল, কিন্তু আমি কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখিনি।

**যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবার**

যুক্তরাষ্ট্রে আমি ১৯৯২ সালে প্রথম যাই। তবে এর আগে ১৯৮৪ সালে একবার আমার আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু সেবার শরীর ভালো না থাকায় আমি অবশেষে যেতে পারিনি। সেটা ছিল আইএমএফ এর একটি প্রোগ্রাম। যখন যুক্তরাষ্ট্রে যাই আমি তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর। আমার জন্য USAID একটি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে। আমি যেহেতু সরকার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়েছি, সে জন্য আমার নিজের বিশেষ ট্রেনিং এর প্রয়োজনে আমাকে বিশ্ব ব্যাংকের একটি বিশেষ ট্রেনিং প্রোগ্রাম করানো হলো। আমার সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন যুগ্ম সচিব জনাব ড. আবদুল মুবিন। তিনি ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসের লোক। পরবর্তীতে তিনি সচিব হয়েছিলেন। তিনি সাবেক অর্থ মন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীতের ছোট ভাই।

আমেরিকা যাওয়ার আগে লন্ডনে আমরা দু'দিন থাকলাম জনাব মুবীনের এক আত্মীয়ের বাসায়। লন্ডনস্থ সোনালী ব্যাংকের প্রটোকল অফিসার আমাদেরকে রিসিভ করলেন। তিনি অত্যন্ত ভালো লোক। তিনি এবং জনাব মুবীন দু'জনেই সিলেটের লোক। খুব ভোরে আমরা হিথ্রো এয়ারপোর্ট পৌঁছাই। ঠাণ্ডাও ছিল ভীষণ। ওভারকোট পড়েই বিমান বন্দর ত্যাগ করি। প্রাইভেট কারে বসেই আমি ফজরের নামাজ পড়ে নেই।

লন্ডনে থাকতে আমার সঙ্গে ড. আব্দুল বারী সাক্ষাৎ করেন, যিনি পরবর্তীকালে ইসলামিক ফোরাম, ইউরোপের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি ফিজিক্সে ডক্টরেট করেছেন। ড. বারী লন্ডনে যাওয়ার আগে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। ছাত্র অবস্থায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। ইসলামী মুভমেন্টের আরেকজন খুব সক্রিয় সদস্য ছিলেন ড. আজিজুর রহমান। খুব সম্ভব তিনিও ফিজিক্সের ছাত্র ছিলেন। তারা এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলে আমি লন্ডনসহ গোটা ইউরোপের অবস্থা বোঝার জন্য একটা ধারণা নিতে চেষ্টা করি। আমি তাদেরকে পরামর্শ দেই এবং আরো সক্রিয় হতে বলি। বিশেষ করে ড. আজিজুর রহমান মনে হচ্ছিল আন্দোলনের প্রতি সময় কম দিয়ে অন্য কাজে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তাকে অনুরোধ করি সে যেন ইসলামিক মুভমেন্টের কাজে আরো বেশি সক্রিয় হয়।

আমরা যেখানে ছিলাম তারা আমাদেরকে অত্যন্ত যত্ন করে, বিশেষ করে আমি মেহমান ছিলাম বলে। লন্ডনের আরেকটি এয়ারপোর্ট 'গ্যাট উইক' হতে TWA এর বিমানে করে আমরা আমেরিকার পথে আটলান্টিক পাড়ি দিলাম। সামগ্রিকভাবে যদিও লন্ডন মানচিত্রের অনেক উত্তরে তারপরও আটলান্টিক পাড়ি দিতে আরো উত্তর দিয়ে বিমান যায়। ঘন মেঘের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বোঝা যায় বেশির ভাগ এলাকাই বরফ আচ্ছাদিত। আমাদেরকে TWA এয়ারলাইন্স যুক্তরাষ্ট্র ল্যান্ড বর্ডার থেকে আরো তিন ঘন্টা ভিতরে পোর্ট লুইস নামক এক বিমান বন্দরে নিয়ে যায়। আমি তখনও এতো ভিতরে যাবার ঘটনাটা বুঝতে পারিনি। তবে পরে জানলাম পোর্ট লুইস হলো TWA এর হেড অফিস। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটা এয়ার লাইন্সেরই আলাদা হেড কোয়ার্টার আছে। সেখানে খুব শক্ত কাস্টমস চেকিং হলো। মনে পড়ে ড. মুবীন পান নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা সেগুলো ফেলে দেয়। এর একটি কারণ হলো প্লান্ট কোরেন্টাইন। প্লান্টের ভিতর জীবানু থাকতে পারে, যা ছড়িয়ে সেখানে পড়তে পারে। কিছু খাদ্য ছিল তাও ফেলে দেয়। আমি কিছুই নেইনি। পোর্ট লুইস থেকে দুই-আড়াই ঘন্টার ফ্লাইটে ওয়াশিংটন পৌঁছালাম। লন্ডন থেকে ওয়াশিংটনের ফ্লাইট খুবই উন্নত মানের। কিন্তু আমি অবাক হলাম অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট খুব খারাপ অবস্থা দেখে। প্লেন চলে ভালো কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণ বাজে মানের। এটা ছিয়ানব্বইতে গিয়েও টের পেয়েছি। তাদের সেবার মানও খুব খারাপ। হয়তবা ব্যয় সংকোচ বা কস্ট কাটিং এর একটা ব্যাপার আছে।

আমেরিকায় অনেক সার্ভিস এজেন্সি আছে। আমরা ওয়াশিংটন পৌঁছলে সে রকমই একটি এজেন্সি আমাদেরকে রিসিভ করে। এই ক্ষেত্রে যারা আমন্ত্রণ জানায় তারা রিসিভ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে না। ভার্জিনিয়া স্টেটের হোটেল ভার্সিনিয়াতে সেই এজেন্সির এক মহিলা আমাদেরকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা দু'জনই আমাদের লাগেজ হারিয়ে

ফেললাম। সন্ধ্যার সময় হোটেলে যখন পৌঁছাই তখন আমরা ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম। আমরা তাড়াতাড়ি বিশ্রামে চলে যাই। কিন্তু  ফজরের পর উঠে দেখি আমাদের লাগেজ পৌঁছে গেছে। সিস্টেমটা খুব ভালো। তারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব সব করে থাকে। হারানো জিনিসে পেয়ে গেলে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

বিশ্বব্যাংকে আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম ছিল সেন্ট্রাল ব্যাংকিং, কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স ইত্যাদির উপর। সেটা ভালো একটা ট্রেনিং ছিল। কিছু কিছু লেকচার ছিল খুবই উন্নতমানের। সেখানে বিশ-পঁচিশটি লেকচারের মধ্যে পাঁচ-সাতটা লেকচার এমন ছিল যা আমার কাছে নতুন দিগন্ত উম্মোচন করে দিয়েছে বলে মনে হলো। সেটা ফাইনান্সিয়াল সিস্টেমের উপর আমার উপলব্ধিকেও অনেক উচ্চ করে। তিন সপ্তাহের ছিল সে সফর।

ভার্জিনিয়ায় থাকতাম। পাতাল রেলে ট্রেনিং সেন্টারে যেতাম। ভার্জিনিয়া হোটেলে স্বাভাবিক সময়ই কাটিয়েছে। সেখানকার একটি ঘটনা বেশি মনে পড়ে। একদিন হোটেলে লিফটের অপেক্ষা করছিলাম। লিফটের সামনে দেখি এক লোক একটি কুকুর নিয়ে যাচ্ছেল। আমি কুকুরটি দেখে হঠাৎ ছিটকে পিছে সরে আসি। কারণ আমি কুকুরকে খুব ভয় পাই। দুইজন বেলবয় যারা মালামাল উঠানামা করে, পাশেই ছিল। তাদের বয়স বড় জোর বিশ কি একুশ হবে। তারা আমাকে আমি কেন এভাবে ছিটকে পড়ার তার কারণ জিজ্ঞাসা করল। আমি উত্তর দেবার আগেই ড. আবদুল মুবীন সাহেব বললেন, হান্নান সাহেব কুকুরকে ভয় পান। এ কথা শুনে সেই বেলবয়দের মধ্যে একজন এমন একটা মন্তব্য করল যা আমার চিরদিন মনে থাকবে। তার মন্তব্য ছিল, Why are you afraid of dog? You should be afraid of American women, the more money you have, the more they love you.

আমি তার সেই মন্তব্যে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সেটা ছিল মেয়েদের প্রতি একটা অত্যন্ত সাংঘাতিক বাজে কমেন্ট। কিন্তু নিশ্চয় সেটা ছিল আমেরিকান সোসাইটির একটা দিকের পরিচয়। তা না হলে সেই যুবক এরকম কমেন্ট করে কিভাবে? তবে আমি নিশ্চিত এটা একটা একপেশে মন্তব্য। যদি আমি মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম তাহলে তারা হয়তো একই ধরনের মন্তব্য বা এরকম কিছু একটা আমেরিকান ছেলেদের সম্পর্কে করত। কেউ হয়ত আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমি মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা না করে এরকম কথা বলছি কেন? কিন্তু বিভিন্ন লিটারেচার পড়ে আমার এরকমই ধারণা হয়।

বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের যারা আছে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করি। সেখানে রিসিপশনে একটি মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। সে মেয়েটি স্কার্ফ পড়া ছিল। পরবর্তীতে জানতে পারলাম তার নাম শাহানা। তার কাছেই তার নিজের সম্পর্কে খোঁজখবর জানলাম। তারা বাবা-মা, ভাই-বোনসহ আমেরিকা আসে। তার স্বামী একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। মেয়েটির বয়স তখন বিশ থেকে বাইশের মধ্যে হবে। তার স্বামী তাকে বারবার বলত হিজাব নেয়ার জন্য। তখন সে নেয়নি। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সে তা গ্রহণ করে। শাহানা একদিন আমাকে ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টার দেখায়। সেখানে নামাজ পড়ি, কিছু লোকজনের সাথে কথা বলি। দুপুরের খাবার খাই করি একটি আজারবাইজানি হোটেলে। কয়েক দিন পর আমি যখন নিউইয়র্ক যাই। সেখানে আমার এক ছোট ভাই ও বন্ধু মীর কাসেম আলীর এক ভাই মাসুম আলী থাকতো। তার ডাক নাম ছিল কামাল। তার বিয়ের কথা চলছিল। আমি কামালকে সেই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বলি। মেয়ের সাথে টেলিফোনে পরিচয় করিয়ে দেই এবং শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে হয়। পরবর্তীতে যখন ছিয়ানব্বই সালে পুনরায় আমেরিকা গেলাম তখন কামাল ও শাহানাদের বাসাতেই আমি ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব কয়েকদিন ছিলাম।

ওয়াশিংটনে ড. মুবীনের আত্মীয়ের বাসাতে বেড়াতে যাই। জনাব আবদুল মুকিত চৌধুরীর সাথে পরিচয় হলো। তিনি আমাকে একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। সেটা একজন মৃতের জন্য দোয়ার অনুষ্ঠান ছিল। সেই দোয়া অনুষ্ঠানে মুকিত সাহেব আমাকে কিছু বলতে বলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে করে আমি কী বলব তা বুঝতে পারছিলাম না। তবু আমি পশ্চিমা বস্তুবাদকে সামনে রেখে কোরআনের একটি আয়াত ব্যাখ্যা করি। আয়াতটি ছিল, ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গাররাকা বে রাব্বিকাল কারীম - হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার রবকে ভুলিয়ে দিয়েছে? আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেই বলেছিলাম, কোনোকিছুই যেন আমাদের থেকে আমাদের রবকে ভুলিয়ে দিতে না পারে। সব সময়ই আমরা যেন আমাদের রবকে স্মরণে রাখি যে রবের কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। অনুষ্ঠানের পরপরই

নামাজের সময় হয়ে গেলো। কিন্তু সেখানেও দেখলাম কিছু লোক চায় না যে, ছেলেমেয়ে একত্রে নামাজ পড়ুক। তবে আমি যখন সকলকে একত্রে নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে বলি তখন আর কেউ বাঁধা দেয়নি।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ট্রেনিং এর সময় সেখানে কোনো নামাজের ব্যবস্থা ছিল না। আমি কোনোরকমে ঘুপচি টুপচি বের করে নামাজ পড়তাম। অন্য মুসলিমরা নামাজ ত্যাগ করে যেত। হয়তো পরে পড়ত। সেখানো ভালো লোক থাকলেও তাদের পক্ষে এতোটা দৃঢ় হওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু আমি কোনো না কোনো জায়গায় নামাজের সময় হলেই দাঁড়িয়ে যেতাম। বিশ্বব্যাংকের ট্রেনিং সেন্টারে ১৯৯২ সালে কোনো নামাজের জায়গা ছিল না। অথচও তারা জানে প্রত্যেক কোর্সে বেশ কিছু মুসলিম ছেলেমেয়ে আসবে। কিন্তু তাদের এদিকে এই খেয়াল নেই। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মূল ভবনের আন্ডার গ্রাউন্ডে একটা জুমার নামাজের জায়গা আছে। আমি দুটা কি তিনটা জুমা সেখানে পড়েছিলাম। তারা জুমার জন্য প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো ছুটি দিতে চায় না। একটা জুমায় আমি অনুরোধ করেছিলাম একটা ক্লাস পরে নিতে। কিন্তু তারা রাজি না হওয়ায় ক্লাস হলো এবং আমি ক্লাস বাদ দিয়ে নামাজেই গেলাম। যদিও ক্লাসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রোগ্রামের প্রশাসক এগুলো পছন্দ করতো না। তিনি বোধহয় উদার লোক ছিলেন না যে কারণেই এরকম হয়। না হলে আমার নামাজে কোনো সমস্যা হতো না।

ওয়াশিংটনের প্রোগ্রাম শেষ করে নিউইয়র্ক রওনা হলাম। কামাল আমাদেরকে রিসিভ করল। তার বাসায় আমি গেলাম। নিউইয়র্ক থেকে ফেরার পথে ড. মুবীনের আত্মীয়ের বাসায় যাই। সেখানে ড. মুবীনের ভাগনী (ডা. শায়লার কন্যা) হার্ভার্ডের ছাত্রী (সম্ভবত লুবনা নাম) সাথে পরিচয় হয় এবং তাকে আমি কয়েকটি ইসলামিক বই দেই। তাকে আমার অত্যন্ত যোগ্য ও মেধাবী বলে মনে হলো। আমি যখনই কোনো ছেলে বা মেয়েকে যোগ্য হিসেবে দেখি তাকেই ইসলামের বই বিতরণ করে থাকে। আমি এটা দেখি না কে কত আধুনিক। আমি চিন্তা করি, আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সঠিকভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। হতে পারে এর ফলে সে আংশিক বা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। সামান্যও যদি বদলায় তাও কল্যাণকর।

এরপর নিউইয়র্ক থেকে আমরা লন্ডন হয়ে ঢাকা ফিরে আসি। লন্ডনে কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম।

**দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রে**

আমি দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাই ১৯৯৬ সালের জুন মাসে। তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব দেশ চালাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের একটা ভিজিটরস প্রোগ্রাম আছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় তাদের দেশ দেখানো জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লোক নিয়ে যায় এবং সেখানে নানা ধরনের প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। যাদেরকে নেয়া হয় তাদের প্রয়োজন মতো করে সেই প্রোগ্রাম সাজানো হয়। যেমন, যদি কোনো সিনিয়র আইনজীবীকে নেয়া হয় তাহলে তাকে তাদের লিগ্যাল সিস্টেম দেখানো হয়। কোনো ব্যাংকার গেলে তাকে তাদের ব্যাংকিং সিস্টেম দেখানো হয়। অর্থাৎ তারা সাবজেক্ট রিলেটেড বিষয়কে গুরুত্ব দেয়।

আমার কিসে আগ্রহ সে বিষয়ে তারা আমার কাছে জানতে চায়। আমি যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় অবস্থা, বিভিন্ন ধর্মের কি কি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং তাদের কি অবস্থা - সেসব আমি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করি। তারা চাচ্ছিল আমি ব্যাংকিং সিস্টেম দেখে আসি। কিন্তু আমি ঐগুলোই পছন্দ করলাম। তারা আমার প্রস্তাবে রাজি হলো এবং সফরসঙ্গী হিসেবে অন্য কারো নাম জিজ্ঞাসা করল। শেষ পর্যন্ত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, বিশিষ্ট কলামিস্ট মোবায়েদুর রহমান এবং আমি গেলাম। আমাদেরকে লন্ডন হয়ে ওয়াশিংটন পৌঁছানোর পরের দিন ইউএস ইনফরমেশন অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বুঝিয়ে দেয়া হলো। কোনো কোনো ইসলামী, ইহুদী এবং খৃস্টান প্রতিষ্ঠান আমরা ভিজিট করব তার তালিকা আমাদের দেয়া হলো। সেই সাথে শহরগুলোও ঠিক করা হলো। এই তালিকায় ছিল ছয়টি শহর ওয়াশিংটন, ডেনভার, ইন্ডিয়ানাপলিস, লসএঞ্জেলস, শিকাগো এবং নিউইয়র্ক। ইউএস ইনফরমেশন অফিসে নিয়োজিত বেশ কিছু গাইড আছে যারা খুবই দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। এরা বিভিন্ন প্রোগ্রামের লোকদের সঙ্গে লিঁয়াজো করে থাকে। পর্যটনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তারা ভালো জানে। তাদেরই মধ্যে থেকে একজন মধ্যবয়সী লোক আমাদের সঙ্গে দেয় হয়। তিনি পুরো প্রোগ্রামে অর্থাৎ ছয় সপ্তাহ আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা প্রত্যেক শহরে এক সপ্তাহ করে ছিলাম।

আমরা বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন খৃস্টান সংগঠন দেখলাম। তাদের ওয়ার্ল্ড চার্চের (সকল চার্চের) কেন্দ্রিয় সংগঠন যেখানে আছে সেখানে গেলাম। তাদের সঙ্গে অনেক ধরনের আলোচনাই হলো। আমি বিভিন্ন প্রশ্নের সাথে দু'টি বিষয়ে তাদেরকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করি। অনৈতিকতা বৃদ্ধির মোকাবিলার জন্য আপনারা কি করছেন এবং বস্তুবাদের বিরুদ্ধে কি করছেন, এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছেন কি না বা ফল হচ্ছে কি না? বিশেষ করে গোটা বিশ্বে তাদের ভাষায় যে যৌন বিপ্লব (সেক্সুয়াল রেভিলুশন) হয়েছে, এডাল্টারি (অবৈধ যৌন সম্পর্ক) বিস্তার লাভ করেছে এর বিরুদ্ধে আপনারা কি চিন্তা করছেন? এই সব মৌলিক প্রশ্ন আমি বিভিন্ন জায়গায় খৃস্টানদের মধ্যে তুলি।

এসব আলোচনায় আমার কাছে মনে হলো, তাদের যেন খৃস্টান মোরালিটিকেই ধরে রাখার প্রতি আগ্রহ বেশি। তার জন্য কোথাও কোথাও তারা চেষ্টাও করছেন। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় তারা যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এই মোরালিটি বা ম্যাটেরিয়ালিজমের যে প্লাবন তার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না বলেই তাদের ধারণা। অবৈধ সম্পর্কের বিস্তার এবং যৌনতাকে যেভাবে সহজ করে নেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে। এই কথাগুলো তারা তুলছে না। তারা যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করছে না। আমার কাছে মনে হলো - আমরা বহু চেষ্টা করেছি, তেমন কিছু হচ্ছে না ভেবে হাল ছেড়ে দিয়েছে। যৌবনে যাই করুক না কেন, এই সময়টা পার হলে জীবনে স্থিতি আসবে। পারিবারিক শৃঙ্খলা আসবে। তখন তারা আমাদের কথা শুনবে। আমরা কিছু একটা তাদের করতে পারব। এই চিন্তা কতটুকু সঠিক জানি না, তবে এরকম দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন আমি তাদের মধ্যে দেখেছি। তবে তাদের মধ্যে আমি অত্যন্ত শক্তিশালী খৃস্টান সংগঠন দেখেছি। একটা সংগঠন আছে যারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে পুরুষদের মধ্যে কাজ করে। তারা এই শপথ নেয় যে, তারা কোনো অনৈতিক কাজ করবে না। আমরা খৃস্টান মিশনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে দেখলাম তাদের ট্রেনিং এর পরিবেশ অনেক উন্নত। সেটা সত্যি একটি কলেজ বা ইউনিভার্সিটির মতোই। লক্ষ্য করলাম, তারা তাদের কোর্সে অনেক আধুনিক বিষয়কে যুক্ত করেছে। কোর্স তো বাইবেলকে ভিত্তি করে আছেই। আরো যেমন সাইকোলজি, ফিলোসফি, ইকোনোমিকসের মতো বিষয় নিয়ে এসেছে যেগুলো একজনকে ভালো প্রচারক বা যাদের প্রিচার হতে সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতো এরকম ব্যবস্থা নেই। তাই সাইকোলোজি সাবসিডিয়ারি হিসেবে হলেও মাদ্রাসা কোর্সে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। কেননা সাইক্লোজি মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে। তেমনি ইকোনোমিকস মানুষের সমস্যা বুঝতে সাহায্য করে। সোসালজি সমাজকে জানতে সাহায্য করে। চিন্তার ক্ষেত্রে কি ধরনের বিভিন্ন চিন্তাধারা আছে তা বুঝতে সাহায্য করে ফিলোসফি। এরকম শিক্ষা পদ্ধতিই আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। তাদেরকে দেখে মনে হলো তারা এ বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন।

সেটা ক্যাথেলিকদের কেন্দ্র ছিল। তারা এখনও প্রিচাদেরকে বিয়ে করতে দেয় না। এটা সত্যিকার অর্থেই একটা সমস্যা হিসেবে রয়েছে যেটা অস্বাভাবিক এবং অযৌক্তিক। এটা তাদের ধর্মের ভিত্তিতে কতটা প্রয়োজন তা চিন্তার বিষয়। একথা ঠিক যে ঈসা (আ) বিয়ে করেননি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, কেউই বিয়ে করতে পারবে না। ঈসা (আ) বিয়ে করেননি এটাই যদি মানতে হয় তাহলে তো কোনো খৃস্টানেরই বিয়ে করা উচিত নয়। সেই সাথে দেখা যায়, প্রোটেস্টানরা বিয়ের অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। এসব দেখে আমার মনে হয়, বিষয়টি ক্যাথলিক চার্চের একটি বিরাট সমস্যা। তারা এমন একটা আননেচারাল পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে যার ফল ভালো হচ্ছে না। অন্যদিকে আবার মানুষ তার স্বভাবের বিরুদ্ধেও চলতে পারছে না।

সফরে আমরা বিভিন্ন খৃস্টান সংগঠন দেখলাম। লক্ষ্য করলাম, তাদের কাজ যেমন বাড়ছে শক্তিও তেমন বাড়ছে। এটাও একটা কারণ যে, বস্তুবাদের বিরুদ্ধেও একটা প্রতিক্রিয়া আছে। সেই প্রতিক্রিয়ারই এটা একটা দিক বলা যায়। অন্যদিকে অনেক ইহুদী প্রতিষ্ঠান আমরা ভিজিট করি। তারা নিউইয়র্কে যে হালোকাস্ট মিউজিয়াম করেছে সেটা দেখলাম। সেখানে নাজিরা জার্মানীতে যে অত্যাচার করেছে এবং যেখানে যেখানে জার্মান অকুপেশন হয়েছিল সেগুলোকে তারা ডকুমেন্ট হিসেবে সংগ্রহ করেছে। তাদের একটা বিরাট প্রদর্শনীর ব্যাবস্থা সেখানে স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। যে কোনো দর্শনার্থীকেই তারা সেটা দেখায়। এটা ইহুদীরাই শুধু দেখাচ্ছে তা নয়, এটা আমেরিকা সরকারের স্পন্সর প্রোগ্রামেরও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটা দেখানো একটা কারণ হতে পারে এন্ট্রি সেমেটিজম বা ইহুদী বিরোধী যে জনমত এখনো আছে তা যাতে না থাকে, এরকম ঘটনা আর না ঘটে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এর ফলে ইসরাইলের পক্ষে বিপুল পরিমাণ অর্থ আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। আমেরিকান পলিটিকসকে প্রভাবিত

করার জন্য এই ঘটনাকে সব সময় সামনে নিয়ে আসা হয় এবং এটাকে ভিত্তি কের ইহুদীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। খৃস্টানদের মধ্যে সিমপেথি সৃষ্টি করা হয়। এমনকি প্যালেস্টাইন ইস্যুতেও তারা এটাকে ব্যবহার করে থাকে। এটা আসলে অনেক ব্যাপক ও জটিল ব্যাপার। এটা যে শুধু একটা সাদামাটা প্রদর্শনী তাই নয়। এর পিছনে ভালোমন্দ দুটি উদ্দেশ্যই আছে বলা যায়।

ইহুদীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেয়ে মনে হলো তারা বেশি অনেক বেশি সংগঠিত ও যোগ্য। তারা তাদের কমিউনিটির প্রত্যেককেই শিক্ষিত ও যোগ্য করে তোলে। এটা একটা অবাক ব্যাপার যে তাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার অনেক বেশি। এটা পরিকল্পিতভাবেই করা হচ্ছে। তাদের এই পরিকল্পনা তাদের জন্য ভালো ফল দিয়েছে। তারা সঠিক কাজই করেছে এবং তাদের কাছ থেকে অন্যদের শিক্ষা নেয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন সময়ে আমরা ইসলামিক সংগঠন দেখলাম। International Institute of Islamic Thought (IIIT) এর অফিস ভিজিট করলাম। সে সময় তারা একটা বিশ্বাবিদ্যালয় চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে পরিকল্পনা আমরা দেখলাম। সেখান থেকে ইসলামি স্টাডিজের গ্রাজুয়েট সহ মাস্টার্স ও পিএইচডি'র প্রোগ্রাম করা হবে। তখনই তারা এসব পরিকল্পনা করছিল। এটা অবশ্য ইতোমধ্যে চালু হয়ে গেছে। সেখান থেকে তাদের লাইব্রেরি প্রকাশনা সম্পর্কে জানলাম। নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বললাম। ট্রিপল আইটি (IIIT) হলো আমেরিকার মুসলমানদের সবচেয়ে বড় থিংক ট্যাংক বলা যায়। এটা ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত। শিকাগোতে আমেরিকান ইসলামিক কলেজও আমরা ভিজিট করি। লস এঞ্জেলস সহ বিভিন্ন জায়গায় আমরা ইসলামিক সেকেন্ডারি স্কুল দেখলাম। তাদের স্কুলগুলো খুবই সুন্দর পরিবেশে তারা করছে। এর জন্য লোকাল কমিউনিটিকে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কয়েকশ হাইস্কুল ইতোমধ্যে সেখানে হয়েছে। আরো অনেক হওয়ার দরকার। স্কুলগুলো যথারীতি আমেরিকান কারিকুলাম মেনে চলে। সেই সাথে তারা কারিকুলামে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ যোগ করেছে। উপরের দিকে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা পড়ানোর চেষ্টা করা হয়। সেখানে প্রায় মেয়েই ইসলামিক পোষাক পড়ে। ২০০১ সালে সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনার পরে হিজাব চাপের মধ্যে থাকলেও দিন দিন এর সংখ্যা বাড়ছেই।

সেখানে আমরা ইসলামিক মুভমেন্টের বিভিন্ন ছেলের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারি। সেখানে তাদের যথেষ্ট সক্রিয় দেখলাম। বাংলাদেশীরা সেখানে ইসলামী উম্মাহ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এর কারণ হিসাবে তারা জানায়, বিভিন্ন কারণে তারা আরব কিংবা পাকিস্তানীদের সাথে মিলে কাজ করতে পারে না। ফলে তারা কিছু স্বতন্ত্র পথেই অগ্রসর হতে চায়। তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে। তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করেছি। আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতাম, বাংলাদেশীদের কাজ আমেরিকাতে আলাদাভাবে হওয়া উচিত নয়। আমি এটাই মনে করেছিলাম যে, সেখানে বাংলাদেশী মুসলমানরা ভাষার স্বতন্ত্রে পৃথক না থেকে ইসলামের ভিত্তিতে কাজ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সত্য যে, সেখানে আরব ও পাকিস্তানী সহ অন্যান্য অনেকেরই আলাদা সংগঠন আছে। আবার Islamic Society of North America (ISNA) বা Islamic Center for North America (ICNA)-এর মতো সামগ্রিক সংগঠনও আছে। এরকম বৃহৎ সংগঠন ছাড়াও সেখানে আরো অনেক সংগঠন আছে। MSA, AMSB এরাও উল্লেখযোগ্য।

আমার ধারণা তারা যতই তৃতীয়, চতুর্থ কিংবা পঞ্চম প্রজন্মের দিকে পৌঁছাবে ততই তাদের মধ্যে এই লোকাল আইডেন্টিটি কমে যাবে। তখন বাংলা বা উর্দুর এতো প্রভাব তাদের মধ্যে থাকবে না। তাদের মাতৃভাষা হবে ইংরেজি। আশা করি, তখন তারা এক আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটি হিসেবে গড়ে উঠবে। বাস্তবে সেটাই হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ এসব ছোট ছোট দল থেকে একটা বৃহৎ দলে আমেরিকান মুসলিম আইডেনটিটি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

**আবার যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকদিন**

আমি তৃতীয়বারের মতো আমেরিকা যাই ২০০০ সালের অক্টোবরে। সেটা আমার ব্যক্তিগত সফর ছিল। এরই মধ্যে আমি সরকার থেকে অবসর নিয়েছি। সে বছর আগস্ট মাসে আমি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। আমার সেই সফরের টিকিট বিমান দিয়েছিল। এর কারণ হলো অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সেক্রেটারি হিসাবে আমি দুই বছর পর্যন্ত বিমান বোর্ডের সদস্য ছিলাম। বিমানের নিয়ম হলো বোর্ড সদস্যরা বছরে কয়েকটি

টিকিট পান। একটা সম্পূর্ণ ফ্রি এবং দু'তিনটি টেন পার্সেন্ট মূল্যে পাওয়া যায়। আবার রিটায়ারমেন্টের পরে তিন বছর পর্যন্ত একটা করে ফুলফ্রি টিকেট পেতে পারে। আমার সেই বছরই টিকেটের শেষ সময় ছিল। আমি তাদেরকে বললে তারা আমাকে ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা আসা যাওয়ার ফার্স্ট ক্লাস টিকিট দেয়। আমার এই ব্যক্তিগত সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিছুদিন বিশ্রাম নেয়া। মাত্র কয়েকদিন আগে আমার স্ত্রী মারা যান। এদিকে অন্য কিছু সমস্যাও ছিল। সব কিছু মিলিয়ে আমার মনটাও খারাপ ছিল। অন্যদিকে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি ছিল আমি যেন আমেরিকা থেকে বেড়িয়ে আসি। সেই সব বিষয়কে সামনে রেখেই সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। একই সময় Association of Muslim Social Scientist (AMSS) এর পক্ষ থেকে তাদের ২৯তম সম্মেলনে আমার দাওয়াত ছিল এবং সেই সাথে সম্মেলনে আমার একটি প্রবন্ধ পড়ার কথাও ছিল।

দীর্ঘ চব্বিশ ঘন্টার জার্নিতে দুবাই, লন্ডন হয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছাই। সেখানে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইমরান, ববি, সারা আহমদ, কাওসার আহমদ, শিবলী সহ কয়েকজন আমাকে রিসিভ করে। প্রথমে কাওসার আহমদের বাসায় গিয়ে ঘন্টা দুয়েক থাকি। সেখান থেকে গেলাম নিউজার্সিতে ইমরানের বাসায়, সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ইমরান ও ববি তাদের বাসায় আমার সকল ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করে। ড্রইং রুমে একটা স্পেশাল খাট পাতা হলো আমার জন্য। তার একটা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লাইব্রেরি আছে। প্রায় বিশ দিনের মতো আমি এখানে ছিলাম। মধ্যে মাত্র তিনদিন ওয়াশিংটনে ছিলাম। ইমরানদের বাসায় যাবার সময় আমি আইসিএনএ'র হেড কোয়ার্টার ভিজিট করি। সেখানে আমি মুসলিম বিশ্বের সমসাময়িক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখি। আমি একটি জিনিস দেখে অবাক হলাম। যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান বিশেষ করে বাংলাদেশী মুসলিমদের মধ্যে এখনো গণতন্ত্র নিয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তি আছে। সেটা আমি তাদের দূর করার চেষ্টা করলাম। তবে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বলতে পারি এই ভ্রান্তি ক্রমাগত দূর হচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদেরই মুখপত্র 'ম্যাসেজ ইন্টান্যাশনাল'-এ ডেমোক্রেসির উপর একটা বিশেষ ইস্যু বের হয়েছে। সেখানে আমারও একটা লেখা আছে, তাতে আমি গণতন্ত্র সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা আছে তার উল্লেখ রয়েছে। ড. মুমতাজ আহমদের একটি রেখা Democracy in Islam : The Emerging Consensus অনলাইনে পড়ছিলাম। এসব থেকে প্রমাণ হয় গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু জায়গায় যেসব ভুলভ্রান্তি ছিল তা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে। বিশেষ করে এ ব্যাপারে রশীদ ঘানুশী অনেক কাজ করছেন। ড. কারযাভীর কারণেও এটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমিও আমার সাধ্যমতো যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি। গত কয়েক বছর ধরে আমি এর উপর পরিশ্রম করছি।

নিউনিয়র্কে যাওয়ার পর আমার সঙ্গে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের দুটি টেলিফোন কনফারেন্স হয়। একটি ছিল জেন্ডার ইস্যুর উপর। উইটনেসের মেয়েরা, যারা এখান থেকে গিয়েছে এবং যারা ওখানে আছে তাদের মধ্যে চার-পাঁচ জন নিজেদের জেন্ডার সংক্রান্ত জমা প্রশ্নগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা টেলিফোনে আলোচনা করে। সেখানে যত ধরনের প্রশ্ন ছিল তার উত্তর আমি দেয়ার চেষ্টা করেছি। জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি আমার 'নারী ও বাস্তবতা' বইতে তুলে ধরেছি। সেখানে বিষয় বলা আছে। সেই টেলি কনফারেন্সে ড্রেস সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা আমি আমার মতো উত্তর দিতে চেষ্টা করছি। মেয়েদের জিন্স পড়া নিয়ে আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেখানে মেয়েদের জিন্স প্যান্ট পড়তে হয়। সেসব দেশে খুব শীত থাকে। আমি তাদের বললাম - আমি তাতে কোনো সমস্যা দেখছি না। আমি বলছি, প্রয়োজন হলে পড়বে, সতর ঢাকাটাই হিজাবের বড় কথা। সেখানে ড্রেস সংক্রান্ত বিষয়টিই বারবার চলে আসে বিভিন্ন দিক থেকে। হিজাব করতে হবে - সেই বিষয়ে কোনো দ্বিমত ছিল না। কারণ ইসলামে হিজাবের শিক্ষা ইউনিভার্সেল এবং তা অবশ্যই পালনীয়। এটা অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় - এতে কোনো সন্দেহ নাই। লক্ষ্য রাখতে হবে, পুরুষ ও মেয়েদের পোষাক যেন সম্পূর্ণ এক রকম হয়ে না যায়। এটা খেয়াল রাখা উচিত। বিষয়টি সার্বিকভাবে দেখতে হবে। হাতে মোজা, পায়ে মোজা কিংবা গলায় যদি কেউ রুমাল পড়ে তাহলেই পুরুষ বা মেয়ের পোষাক এক হয়ে যায় না। সেই জন্য সামগ্রিকভাবে তা দেখতে হবে এবং একই সাথে তার স্পিরিটকে দেখতে হবে। ইসলামে সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্পিরিটটা তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই হিজাবের সীমার মধ্যে আমি এ কথাগুলো বললাম। সেই সাথে শীত ও কষ্টের কথা আমার জানা ছিল। পোষাক পড়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে নামাজে যাতে কোনো সমস্যা না হয়। উঠতে বসতে যাতে সমস্যা না হয়। এরকম নানা বিষয় সেখানে এসেছিল। তাদেরকে আমি বিখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞ ড. জামাল আল বাদাবীর সঙ্গে আলাপ করতে বললাম।

আরেকটি টেলিফোন ইন্টাভিউ উইটনেস পাইওনিয়রের লীডারশিপের সঙ্গে হলো। আটদশ জনের সাথে সেই আলাপের মূল বিষয় ছিল উইটনেস-পাইউনিয়ার সংগঠন নিয়ে আমি কি ভাবছি। সেই সাথে ছিল প্রশ্নোত্তর। উইটনেস-পাইওনিয়ার প্রসঙ্গে আমি জানালাম, আমি ঠিক করেছি, একটা উচ্চমানের ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ তৈরি করতে হবে যারা সারা মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে অভাব বা শূন্যতা আছে তা পূরণ করতে সহায়তা করবে। উইটনেস পাইনিয়রকে নিয়ে এ কাজ আমি বাংলাদেশেও শুরু করেছি। আমাদের অনেক লোক তৈরি করা দরকার। য হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাদের লোক তৈরি সহ বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলোই করতে হবে। সেই সাথে বললাম, উইটনেস ও পাইওনিয়রে মূল লক্ষ্যই হচ্ছে কতগুলো কারেন্ট ইস্যুর দিকে বেশি নজর দেয়া। যেমন ইসলামের কোনো পড়াশুনা ঠিক মতো হয় না যদি উসুল-আল-ফিকহ জানা না যায়। উসূল-আল-ফিকহ বা কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার মূলনীতি জানা না থাকলে ভিত্তি খুব দুর্বল হয়। সকলকে কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার মূল বিষয় জানতে হবে। আমি এটা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে বলি।

আমি এক্সট্রিমিজমকে (চরমপন্থা) খুব বড় সমস্যা হিসেবে ধরে সেই বিষয়ের উপর জোর দিলাম। এটাই ইসলামকে ক্ষতি করবে। পরবর্তীতে কি ক্ষতি হয়েছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সংস্কারের জন্য সারা বিশ্বে আমাদের এটা নিয়ে কাজ করতে হবে। কোরআনে যেটাকে মধ্যমপন্থা বা উম্মতে ওয়াসাত বলা হয়েছে সেটার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। আমি তাদেরকে ড. কারযাভীর বিখ্যাত বই Islamic Awakening between Rejection and Extremism এর উপর নজর দিতে বললাম। বইটি বাংলা আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি বইটি তাদের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বললাম।

তৃতীয়ত, আমি জেন্ডার বিষয়কে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য মেজর প্রশ্ন হিসেবে নিয়ে আসি। এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরি। আমার বিভিন্ন বইয়েও তা আছে। নারীদের যে শুধু সম্মান করতে হবে তাই নয়। নারীদেরকে সমান মানুষ ভাবতে হবে। তাদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং শারিরিক গঠনে কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তারা সমান। সেই দায়িত্ব এবং মর্যাদা তাকে দিতে হবে। তাদেরকে ইসলামের কাজে পুরোপুরি জড়াতে হবে। সমাজে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত হওয়ার সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। তাদেরকে কোনোভাবে বঞ্চিত করা ইসলামের লক্ষ্য নয় এবং এটা ইসলামের কোনো উদ্দেশ্যকে পূরণ করবে না। ড. কারযাভী, ড. জামাল বাদাবী, ড. হাসান তুরাবী, আব্দুল হালিম আবু শুক্কাহসহ বড় বড় আলেমগণ এই কথাই বলেছেন। এ ব্যাপারে সব স্কলাররাই যে একমত তা বলছি না, তবে ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রধান ধারার (মেইন স্ট্রিমের) একটা বড় অংশই এই কথা বলেছেন। আমি সেই সাথে তাদেরকে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বললাম। আল্লাহর আইনের অধীনে সেটা হবে। যে নামেই করি না কেন। হোক তা খিলাফত, গণতন্ত্র বা ইসলামী গণতন্ত্র - তাই আমাদের করতে হবে।

উইটনেস-পাইওনিয়ার বাংলাদেশীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না আন্তর্জাতিক হবে সে সম্পর্কে আমি তাদেরকে বলেছি। সেটা নিয়ে পরবর্তীতে তাদের কারো কারো মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, যেহেতু এই সংগঠনটি প্রথমত প্রতিষ্ঠা করেছিল আমার ছাত্র এবং ছাত্রীরা, সেই হিসাবে কতকগুলো বিষয়ে তাদের মধ্যে চিন্তার ঐক্য আছে। এই চিন্তার ঐক্য ভাঙা ঠিক হবে না। যেহেতু এটা একটা ইন্টেলেকচুয়াল এবং ভার্চুয়াল (যেখানে শারীরিকভাবে একত্র হওয়া হয় না) সংগঠন, কোনো এলাকা ভিত্তিক সংগঠন না, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি জায়গায় এরা ছড়িয়ে আছে, সে জন্য এটা শুধু ইন্টানেটের মধ্যেমেই চলে। কাজেই শুরুতেই দশ-বারো বছর পর্যন্ত এর নেতৃত্ব থাকতে হবে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। এটা এই জন্য যে এখানে যাতে চিন্তার ঐক্যটা নষ্ট না হয়। এর সদস্য কাদের করা হবে সে বিষয়েও আমি তাদের বলেছিলাম। যদিও চূড়ান্ত লক্ষ্য আন্তর্জাতিক হওয়া কিন্তু প্রথম দিকে শুধু প্রতিষ্ঠাতা ছাত্র-ছাত্রী, তাদের পরিচিতদের এবং তাদের মাধ্যমে যারা ইসলামী দাওয়াত পাবে তাদেরই এর সদস্য হওয়া উচিত যাতে প্রথম থেকেই খুব শক্তভাবে এ সংগঠন গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে কারো কারো মনে হয়তো এই সন্দেহ জন্মেছে যে, আমি এটাকে সীমিত করছে চাচ্ছি। ফলে তা আন্তর্জাতিক হতে পারবে না। হতে পারে এটা তার একটা বিবেচ্য পয়েন্ট। কিন্তু আমি মনে করেছিলাম এবং এখনও করি যে, উইটনেস-পাইওনিয়ারের মূল বক্তব্যে ও এর আইডিয়াতে যদি কেউ ঐক্যমত্য পোষণ করে তাহেল নতুন লোক আনায় আমি কোনো সমস্যা দেখি না। আর তা না করা হলে এই সংগঠনে সমস্যা হতে পারে। বাস্তবিকই দেখা গেছে পরবর্তীতে সমস্যা হয়েছে। তার ফলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট টানাপোড়নের সৃষ্টি হয়। অবশ্য সেই টানাপোড়ন ইতোমধ্যে দূর হয়েছে। তারা এও বুঝেছে যে, শুরুতে সংগঠনকে বাইরে ছড়িয়ে দেয়া বেশি সুবিধার হবে না। আমি

এর গতি সম্পর্কে বলেছি, সরাবিশ্বেরই লোক নেয়া যাবে কিন্তু আস্তে আস্তে। শুরুতেই নেতৃত্ব অন্যের হাতে দেয়া ঠিক হবে না। দ্বিতীয়ত জেন্ডার, একট্রিট্রিমিজম এর মতো বিষয়গুলোতে একমত না হলে তাদের সদস্য করা ঠিক হবে না। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে যাতে সংগঠনের চিন্তার ঐক্য থাকে, চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বা বিভক্তি না আসতে পারে।

আমেরিকা অবস্থানকালে ওয়াশিংটনে এএমএসএস-এর একটি সম্মেলনে যাই। সেখানে বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেলে আমি আর ইমরান দুই রাত ছিলাম। সেই সম্মেলনে আমার এবং ড. কবির হাসানে যৌথভাবে লিখিত একটি পেপার পড়া হলো। সেটা কবির হাসান উপস্থাপন করে। সম্মেলনের একটি সেশনে আমি সভাপতিত্ব করি। এএমএসএস হলো মুসলিম এসোসিয়েশন অব সোসাল সাইন্টিস। ইসলামই তাদের অনুপ্রেরণার ভিত্তি। এর উপর ভিত্তি করে তারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় গবেষণা করে। এটা বর্তমানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এটা একটা বড় সংগঠন এবং সবখানে তার লোক আছে। মূলত সেখানে রিসার্চ ও কনফারেন্সের কাজ বেশি হয়। সেই সাথে থাকে তাদের ন্যাশনাল কনভেনশন। এর সভাপতি তখন ছিলেন ড. মুমতাজ আহমদ। তিনি একজন পাকিস্তানী। তিনি বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার সফর করে গেছেন। তিনি তাবলীগ জামাত, মাদ্রাসা সিস্টেম প্রভৃতি বিষয় স্টাডি করেছেন। এর জন্যেও তার বাংলাদেশে আসতে হয়। তার মতে ড. সোলায়মান নিয়াংগ (Soleyman Nyang) হচ্ছেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ট রাষ্ট্র বিজ্ঞানী। তখনও আমি তাকে চিনতাম না। দেখতে আমার মতো হেংলা পাতলা। নাইজেরিয়ান। রঙে কালো - শুধু এই পার্থক্য। আমি তাকে বললাম অর্থনীতির ক্ষেত্রে ড. ওমর চাপরা যে রকম কাজ করেছেন সেরকম কাজ পলিটিক্যাল সয়েন্সে হয়নি। আমি তাকে এরকম কাজ করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি এবং ড. মুমতাজ রাজি হলেন এরকম কাজ করার জন্য এবং আমি আশা করি একাজ তারা করবেন।

এই সফরে উইটনেস-পাইনিয়ার সংক্রান্ত অনেক কাজ হয়। আমার ফিরে আসার দুদিন আগে আমর এক ছাত্রী সাইয়েদা রাজিয়া সুলতানা এবং তার স্বামী ড. মাহবুব রাজ্জাক (এখন তারা দুজনেই পিএইচডি শেষ করেছে) তারা কানাডা থেকে আসে। তারা দুজনই তখন কানাডায় পিএইচডি করছিল। তাদের সঙ্গে দুদিন অনেক আনন্দে কাটে। আসার দিন মাহবুব, ইমরান ও শিবলী আমাকে নিউইর্ক এয়ারপোর্টে পর্যন্ত গিয়ে বিমানে উঠিয়ে দেয়। আমি ঢাকা ফিরে আসি।

**কাজাকিস্তান সফর**

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ের উপর 'সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম' নামে গত শতাব্দীর সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে আমি একটি বই লেখি। সম্প্রতি বইটির ইংরেজি সংস্করণ বেরিয়েছে। সেটি বর্তমানে আমার Law Economics and History বইয়ের History অংশ সংযুক্ত আছে। সে বইতে কাজাকিস্তানের কথাও উল্লেখ আছে। গত ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে কাজাকিস্তান যাই। আইডিবির ২৮তম এই সম্মেলন কাজাকিস্তানের সবচেয়ে বড় শহর আলমাতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি মোটামুটি জানতাম কাজাকিস্তান বিশ্বের নবম বৃহত্তম দেশ। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত এর পর কাজাকিস্তান। রাশিয়া ১৮৭০ থেকে ৭৬ এর মধ্যে কাজাকিস্তান দখল করে নেয়। পরবর্তীতে ১৯১৭ সনে রাশিয়ার জারের পতন ঘটায় ক্রেমনোস্কির নেতৃত্বে ডেমোক্রেটরা। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সংহত হওয়ার আগেই পুনরায় বিপ্লব হয় সে বৎসরই। জারের অধীনে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কাজাকিস্তান ছিল। এর পর কমিউনিজমের অধীনে ছিল ১৯৯১ সালের স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত। তাদের কিছু তেল শিল্প ছাড়া তেমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই। সেখানে গমের উৎপাদন ভালো। বাকি সবই তারা আমদানী করে।

কাজাকিস্তানে জমি অনেক, মানুষ কম। সেখানে কৃষির সম্ভাবনা খুব ভালো। সেখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ মুসলিম, বাকি ৩০ ভাগ রাশিয়ান নন মুসলিম। জনসংখ্যার ৬০ ভাগই কাজাক। রাশিয়ান বসতকারী ৩০ ভাগ আর অন্যান্য ছোটখাট গোষ্ঠী মিলে ১০ ভাগ।

আসতানা এয়ার লাইন্সের পুরানা এয়ারক্রাপ্টে করে আমরা দুবাই থেকে আলমাতি যাই। প্লেনের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। বিমান বন্দর থেকে ল্যান্ড করার পর যখন বেরিয়ে আসলাম তখন পথে কোনো মসজিদ দেখতে পেলাম না। পরে জানতে পারলাম সেই শহরে মোট ১৫টি মসজিদ আছে। আর গোটা কাজাকিস্তানে আছে ১৫০০

মতো মসজিদ। এই কথা আমাকে আলমাতি শহরের চিফ ইমাম জানালেন। আলমাতি শহরের প্রধান ইমামকে তারা বলে ইমামে শহর। সেই ইমামের বয়স পয়ত্রিশের মতো। মুখে কোনো দাড়ি নেই। ইয়াং ম্যান। মাথায় বিরাট পাগড়ি। মুসলমানদের মুখে দাড়ি বেশি দেখা যায় সাধারণত আরব বিশ্বের কিছু এলাকায় এবং আমাদের সাবকন্টিনেন্টে। আরব বিশ্বের মধ্যে আবার সৌদি আরব, কুয়েত, ইয়েমেন এসব এলাকায় বেশি। সে তুলনায় ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কিংবা উত্তর আফ্রিকায় দাড়ি কম দেখা যায়।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল পর্যন্ত যেতে যেতে কাজাকিস্তানে যে ইসলাম আছে তার কিছুই দেখতে পেলাম না। এটা আমার কাউকে নিরাশ করার জন্যে বলা নয়, এটাই হচ্ছে বাস্তব অবস্থাটা। ইসলাম কোথাও আছে কি না তা বোঝার জন্য আমরা লক্ষ্য করি সেখানে মসজিদ আছে কিনা, লোকজনের মুখে দাড়ি আছে কিনা অথবা মেয়েরা হিজাব পড়ে আছে কিনা। যে কেউ বাংলাদেশে এসে এসব দেখতে পাবে। এসব দেখেই তারা ইসলামী দেশ বলে আমাদেরকে সনাক্ত করে। সেখানে আমি মেয়েদের পশ্চিমা পোশাকে দেখেছি। তবে এটা ঠিক আলমাতি শহরের অর্ধেক রাশিয়ান। ছুটির দিন থাকায় রাস্তায় কম লোক ছিল। এর মধ্য যে কয়জন মেয়ে চোখে পড়ল তাতে বলা যায় প্রতি একশ জনের মধ্যে মাত্র ২/৩ জন মেয়ের মাথায় স্কার্ফ আছে। মেয়েরা শার্ট প্যান্ট পড়া, ওড়না ছাড়া, বুকে অতিরিক্ত কাভার ছাড়া। সেখানে আমি ওড়না, হিজাব. দাড়ি, টুপি কিংবা লম্বা কাপড়ও দেখলাম না। এর দ্বারা আমি যে সেই সোসাইটি ইসলামিক কি আন-ইসলামিক তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। বরং আমার মন বলল এখানে ইসলাম খুব দুর্বল।

আমি যে হোটেলে ছিলাম তার নাম হোটেল রিজেন্ট আলমাতি। এখানেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেশ সুন্দর হোটেল। সেখানকার জনগণের সাথে আমার আলাপ হয়। আমার একটা বইতে আমি লিখেছিলাম, ১৮৯৯ সালে কাজাক পপুলেশন ৩০ ভাগ হয়ে গেছে। এটা কমতে কমতে হয়েছে। কিন্তু গত দশ বছরের কাজাক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হোক আর রাশিয়ানদের চলে যাওয়ার কারণেই হোক আজকে কাজাক ৭০ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসার পর জানতে পারলাম সেখানে মোটামুটি ২০ ভাগ মানুষ নামাজ পড়ে। রোজা আরো বেশি সংখ্যক লোক রাখে। এটা শুনে আমার কাছে সংখ্যাটা খুব একটা খারাপ বলে মনে হলো না। এসব দেখে একজন ইসলামিস্ট হিসাবে আমার মাথা তখন ঘুরছে এই ভেবে যে, এই দেশে ইসলামের কাজ কিভাবে করা যায়? আমি প্রথম নিশ্চিত হলাম কাজাকিস্তান অচিরেই ইসলামের পিলার হবে এরকম কোনো আশা নেই। পঞ্চাশ একশ বছর পর গিয়ে ইতিহাসের আলোকে বলা যায় এখানে হয়ত ইসলামের প্রচার-প্রসার হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কাজাকিস্তানের পক্ষে ইসলামের জন্য রোল প্লে করা সম্ভব নয়। এর মূল কারণ হলো কমিউনিস্টরা গত একশ বছরে সেখানে এত বেশি ডি-ইসলামাইজড করে ফেলেছে যে তা থেকে বেরিয়ে আসতে তাদের অনেক সময় লাগবে।

আমি সেই সাথে আরেকটি জিনিস ভাবছিলাম। যদি এখানে ইসলামের জন্য কাজ করতে হয়ে তাহলে তার জন্য কি করতে হবে? আমি ভাবছিলাম, শুধু ভাবছিলাম। এর পর আমি সেখানকার কিছু কাজাক পুরুষ ও নারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেদেশের মানুষ ইসলামকে ভালোবাসে কিনা? কেননা আমার মন বলল, যদি তারা ইসলামকে ভালোবাসে তাহলে ইসলামের জন্য কাজ করার ও ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু আশা আছে। আর যদি ভালো নাই বাসে তাহলে তো আশাই নাই। তারা মোটামুটি জানাল, তাদের প্রাকটিস যাই হোক, তারা ইসলামকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তারা তাদের আইডেন্টিটির ব্যাপারে সচেতন। তাদের বরং এই বিষয়ে অহমিকা যে রাশিয়ানরা গুড ফর নাথিং। তারা অনেক সুপিরিয়র। এই ধরনের মানসিকতা তাদের আছে। জাতীয়তা আছে। তাদের ভিতর কাজাক ও মুসলিম ফিলিংস আছে। স্বাধীনচেতা মনোভাবও আমি তাদের মধ্যে লক্ষ্য করলাম। তখন আমার মনে একটা আশা জাগল যে, সেখানে কাজ করার অন্তত একটা ভিত্তি আছে।

আমি ডেলিগেট হিসেবে আসা অন্যান্য দেশের বন্ধুদের সাথে, সেখানে কিভাবে কাজ শুরু করা যায় সে ব্যাপারে আলাপ করলাম । আমি জানি এখানে নামাজ পড়ার কথা বলে কাজ শুরু করা যাবে না। আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকার করে সামনে আগাতে হবে। আমার মনে কোনো সাহসই নাই যে, আমি তাদের হিজাব তো দূরের কথা নামাজের কথা বলব, তোমরা নামাজ পড়। তা করাও আমার কাছে কঠিন বলে মনে হলো। তবে আমার মন একটি বিষয় নিয়ে দাওয়াত শুরু করার কথা বলল। যেই কাজ করুক না কেন, অন্তত এটা বলতে পারে, তোমরা নিজেদেরকে যে মুসলিম বল এবং ইসলাম নিয়ে গর্ব কর, তাহলে অন্তত পক্ষে কোরআন শরীফ তোমরা পড়ে ফেল। এতে যদি শতকরা মাত্র একজনও সাড়া দেয় তাহলেও এই এক ভাগই ভিত্তি হবে যারা বাকি ৯৯ জন মানুষকে আস্তে আস্তে

ইসলামের কথা বলবে। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এখানে তাৎক্ষণিক ফলাফলের কোনো অবকাশই নাই। আমাদের দেশের মানুষ কত রকম দাবি করে বসে কিন্তু আমরা ভাবতেই পারি না পরিস্থিতির কারণে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কি রকম পরিবর্তন হয়ে যায়। মালয়েশিয়ায় মুসলিম অমুসলিমদের যেরকম সহ অবস্থান দেখেছি - সেখানে মুসলিমরা হিজাব পড়ছে অমুসলিমরা ওয়েস্টার্ন পোশাক পড়ছে, তাতে আমি বুঝেছিলাম যে জোর করে কোথাও ইসলাম করা যাবে না। এই কথাটিই কাজাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে জোর করে ইসলাম করার আর কোনো অবকাশ নাই। মানুষকে ডেমোক্রেসির অধীনে রাখতে হবে। সবাইকে স্বাধীনতা দিতে হবে। সেখানে মূল কাজ হবে শিক্ষা ও দাওয়াত। এর জন্য কারা এগিয়ে আসবে আর কারা আসবে না তার জন্য আসল বিচারক আল্লাহতায়ালা তো আছেনই। সব কিছুর বিচার তো দুনিয়াতে হবে না। কিন্তু আমরা কেন দুনিয়াতে সব কিছুর বিচার চাই? আল্লাহতায়ালা আখেরাত তো এজন্যই রেখেছেন যে, যারা অন্যায় করবে সেখানে তাদের শাস্তি দেবেন। মালয়েশিয়া থেকে আসার পর আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হল যে, জোর করে ইসলাম করার কোনো সুযোগই নেই। আর কাজাকিস্তান সফরে এসে বুঝলাম, সেখানে এর কোনো সম্ভাবনাও নেই, যদি আল্লাহ কোনো সুযোগ সেখানে দান করেন তা ব্যতীত।

এটা আমার জীবনের একটা নতুন শিক্ষা ছিল। ইসলাম সম্পর্কে বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা এই অঞ্চলে আমরা যেরকম ভাবছি তা সব দেশের জন্য স্ট্রাটেজি নাও হতে পারে। স্ট্রাটেজি আমেরিকার জন্যও এক হতে পারে না। আমরা পড়েছি, strategy and policy cannot be same. পরিস্থিতি বুঝে স্ট্রাটেজি এবং পলিসি পরিবর্তিত হবে। সেখানে কাজাকিস্তানের পলিসি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। সেখানে বাংলাদেশের মতো পলিসি গ্রহণ করা যাবে না। সেখানে বেশ কিছু ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে। কিন্তু তাদের সেভাবে কাজ করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। তাদেরকে মসজিদের বাইরে কাজ করতে দেয়া হয় না। নানা ধরনের বাঁধা সেখানে আছে। এর থেকে উজবেকিস্তানের অবস্থা অনেক ভালো। তবে এটা একটা বিপ্লব যে, যে দেশে ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে কোনো একটা সম্মেলন হয়নি, সেখানে আল্লাহর নাম দিয়ে প্রথমবারের মতো আইডিবি'র সম্মেলন শুরু হয়েছে। তারাও আজ ওআইসির সদস্য। প্রশ্ন হলো, তাদের ভিতর কোনো না কোনো চেতনা কাজ না করলে তারা ওআইসিতে আসবে কেন? তার রেজাল্ট হিসাবে এবারের ২০০৩ সালের আইডিবি সম্মেলন হয়েছে আলমাতিতে এবং প্রত্যেকটি সেশন কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়েছে। গত সত্তর বছর যা হয়নি তাই এবার হয়েছে। আরো লক্ষণীয় ছিল, যিনি সেই দেশের প্রেসিডেন্ট তিনিও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে বক্তৃতা শুরু করেছেন, যিনি একজন প্রাক্তন মার্কসিস্ট এবং প্রাক্তন কমিউনিস্ট। তিনি আগেও প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এখনও প্রেসিডেন্ট। তিনিও তার বক্তৃতায় মুসলিম উম্মাহর কথা বলেছেন। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দরকার বলেছেন।

কাজাকিস্তানের অবস্থা দেখে আমার মন খুব খারাপ ছিল। না খেতে পারছি, না দাঁড়াতে পারছি। পরিস্থিতির এতটা কল্পনা করিনি। মন অস্থির হয়ে আছে। সেখানে একটা কাজাক মেয়েকে পেলাম যে সম্পূর্ণ হিজাবে আবৃত ছিল। ভাগ্যক্রমে আমার পাশেই এসে সেই ইয়ং মেয়েটি বসল। ইনভেস্টমেন্টের উপর সেমিনার হচ্ছিল। আমি সুযোগ পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মতো কয়টা মেয়ে হিজাব পড়ে। সে নিজেই মাত্র এক বছর আগে হিজাব শুরু করেছে বলে জানাল। মেয়েটি ইংরেজি জানে। তবে ভালো ইংরেজি জানে না। সে জানাল আস্তে আস্তে হচ্ছে। সে আরো জানাল সেখানে ইসলাম নিষিদ্ধ ছিল। সে দেশে হঠাৎ করে ইসলাম আসবে না, ধীরে ধীরে হবে।

ড. গুলিরা নাজার বায়েক নামে এক মহিলার সাথে দেখা হয়। আমি আমার Social Laws of Islam বইটির পাঁচটি কপি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই বইয়ের চারটা কপিই বিলি হয়ে যায়। পঞ্চম কপিটি সেখানকার এক রিসিপশনিস্ট মেয়েকে দেব বলে ঠিক করেছিলাম, তার নাম নাজ গুল। আমি সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরিয়ে চা খাচ্ছিলাম। বইটি আমার হাতে দেখে সেই মহিলা ড. গুলিরা সরাসরি বইটি চেয়েই বসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বইটি আমি কোথায় পেয়েছি? আমি যেই বললাম, বইটি আমার লেখা, তখন তিনি বললেন বইটি আমাকে দিয়ে দিন। পঞ্চম কপিটি তাকে দিলাম। চিন্তা অনুযায়ী সেই মেয়েটিকে আর দিতে পারলাম না। সেখানে আমি বই নিয়ে যাওয়ার যে কি বেনিফিট তা বুঝতে পারি।

ইসলামের কাজে দাওয়াতের জন্য প্রচণ্ড মন থাকতে হয়। সেটা আসলে আমাদের অনেকের মধ্যে নেই। আমরা এটা বুঝতে পারি না যে একটা শক্তিশালী বোধ ও কার্যকরী দাওয়াতী মন আমাদেও নেই। আমি ইচ্ছা করে পাঁচটি কপি

নিয়েছিলাম, বেশি নিলে যদি সেখানকার কাস্টমস ধরে- সে ভয় আমার ছিল। যাওয়ার পথে দুবাই এয়ারপোর্টে ১২ ঘন্টা থাকতে হয়। সেখানে এক আফ্রিকান যুবকের সাথে দেখা হয়। সে সোমালিয়ার ছেলে। ইংল্যান্ডে জন্ম হওয়ায় সোমালিয়া সম্পর্কে ভালো করে বলতে পারবে না বলে আমাকে জানালো। তার ঈমান বেশ মজবুত বলে লক্ষ্য করলাম। সে ইসলামকে সাংঘাতিক ভালোবাসে। কিন্তু সে ইসলামের বই পড়েনি। সাইয়্যেদ কুতুব, হাসান আল বান্নার নামও জানে না, যদিও তার জানার কথা ছিল। তাকে আমি ইসলাম, মুসলমান সম্পর্কে বললাম এবং ওয়াদা করালাম ইসলামের উপর পড়াশুনা ও কাজ করার জন্য। তাকে অনুপ্রেরণা দিলাম খুব। সে বলল, ইনশাআল্লাহ আমি করব, আমি আপনার কাছে ওয়াদা করছি। আমি তাকে আমার বইয়ের প্রথম কপিটি দিলাম। এর জন্য আমি আবার বলি আমাদের একটা প্রচণ্ড দাওয়াতী মন থাকতে হবে। সেটা কিন্তু বাস্তবে আমাদের নেই। আমরা ইসলামের জন্য খুব কম কাজ করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াতকে আমার জীবনের সাথে মিশিয়ে ফেলেছি। ফলে দাওয়াতের জন্য আমাকে আলাদা করে পরিকল্পনা করতে হয় না। এটা আমার জীবনেরই একটা অংশ। আমার সাথে একটা ফাইল সব সময়ই থাকে। যেখানেই সুযোগ পাই তার ভিতর থেকে অবস্থা বুঝে কাগজ-পত্র বিতরণ করি। আমাদের দাওয়াতী মানসিকতা থাকতে হবে। কোনটা ভালো মেটেরিয়াল, কোনটা ভালো নয় সে পার্থক্য করার বোধ আমাদের থাকতে হবে।

মস্কোতে থাকেন এমন একজন আজারবাইজানি মুসলিম ব্যাংক অফিসারও জানালেন সেখানে ইসলাম নিষিদ্ধ ছিল। অগ্রগতির জন্য সময় লাগবে। কাজাকিস্তান সফরে গিয়ে আমি প্রথমে শক্ড হয়েছি। কাজাকিস্তান যে এতটা ডি-ইসলামাইজড তা আগে বুঝিনি। কোনো মুসলিম কান্ট্রি এতটা ডি-ইসলামাইজড তা আগে দেখিনি। আমি বাংলাদেশকে ইসলামের আলোকে খারাপ মনে করি। কিন্তু কাজাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশকে জান্নাতুল ফেরদৌস বলতে হবে। এ জন্য পরিপ্রেক্ষিতের (পারসপেকটিভ) বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোন অবস্থান থেকে আমি দেখছি তা গুরুত্বপূর্ণ। কাজাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ দেখলে মনে হবে বাংলাদেশ জান্নাতুল ফেরদৌস। আর রাসূলের সময়ের মদিনা থেকে দেখলে মনে হবে এখানে দুষ্টতে ভরা। এজন্য আমরা আমাদের জাজমেন্ট কোত্থেকে করছি তা বুঝার বোধও আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। তাই কাজাকিস্তানে কয়েক পারসেন্ট মেয়ে যদি হিজাব পড়ে তাহলে আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা যেন বাস্তববাদী হই। আমরা যেন বুঝতে শিখি। আমরা সব কিছুকে যেন খারাপ না বলি আবার সব কিছুকে যেন ভালো না বলি। বাংলাদেশের সব খারাপ এটা আমাদের বলা উচিত নয়। আবার কাজাকিস্তানের সব খারাপ তাও বলা ঠিক না। আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই তাদের ঈমান দেখবেন। কমিউনিস্ট ডিক্টেটরের অধীনে তারা যে তাদের ঈমানকে টিকিয়ে রেখেছে তাই তো অনেক। আমরা বাইরের দিক দেখে বিচার করে অভ্যস্ত। আমি তাদের হিজাবকে দেখেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাজমেন্ট অনেক গভীর হতে হবে।

সেজন্য কাজিকিস্তানে ইসলামের জন্য কাজ করতে প্রত্যেক মুসলিম দেশের দূতাবাস সেখানে খোলা উচিত। আমি জানি একটা এম্বেসি খোলা যথেষ্ঠ খরচের ব্যাপার। কিন্তু সে খরচও খুব বেশি নয়, বড়জোর বছরে দুই কোটি টাকা। সেখানে বাংলাদেশেরও দূতাবাস খোলা উচিত। পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব সেখানে দূতাবাস খুলেছে। সেই সাথে আমাদের ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের বলব তাদের সে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাওয়া উচিত। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করা একদম ফ্রি। তাই ব্যবসা-বাণিজের অবাধ সুযোগ রয়েছে। সেখানে ব্যবসায়ীরা গেলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে। আমাদের দেশে যেমন সূফি, ব্যবসায়ীরা ইসলাম প্রচার করেছে সেখানেও সে দেশের ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যবসায়ীরা দায়িত্ব নিতে পারে। ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত বলে একজন ব্যবসায়ী সেখানে একটা অফিস খুললে সেটা সে দেশের মুসলমান জনগণের অগ্রগগতিতে সহায়ক হবে। পারস্পরিক পরিচয়ের মাধ্যমেই কাজ আগাবে। সেখানে তাড়াহুড়োর কোনো অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, বাংলাদেশেও আমাদের অধৈর্য হওয়া ঠিক নয়। আমাদের কাজ বেশি করতে হবে এবং হিকমতি প্রয়োগ করতে হবে। তাড়াহুড়ো করতে গেলেই সব খারাপ হয়ে যাবে। তার মানে এই না যে, অযোগ্যতার কারণে আমার দেরি করি। তার জন্য যোগ্যতা বৃদ্ধি করে আমাদের আউটপুট বাড়নোর দরকার।

কাজাকিস্তানে পারমানবিক প্রকল্প আছে কিন্তু তা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে। সেখানে রাশিয়ান এবং কাজাকদের মধ্যে এক রকম টেনশন কাজ করে। সরকারি কাজ কাজাকরা পায়, রাশিয়ানরা পায় না। প্রাইভেট সেক্টরে আবার রাশিয়ানরা বেশি যোগ্য হওয়ায় বেশি সুযোগ পায়। আমার যতটুকু মনে হয়েছে, কাজাকরা রাশিয়ানদের সাথে একটা সম্পর্ক রেখেই চলতে চায়। একে তো জনসংখ্যার ৩০ ভাগ রাশিয়ান, আবার রাশিয়া প্রতিবেশি।

সেখানে যে সমস্ত ইসলামিক প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেয়ার সুযোগ আমার হয়নি। কাজাকিস্তানে ইসলামের কাজ এগিয়ে নিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন মুসলিম দেশে কাজাক স্টুডেন্টদেরকে স্কলার শিপ দিতে হবে। এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার অনেক সুযোগ আছে।

**বৃটেন সফর**

আমি যুক্তরাজ্যে চারবার যাই। প্রথমবারের কথা ইতোমধ্যে এসে গেছে অন্য এক অধ্যায়ে। সেটা ১৯৯২ সালের কথা। ১৯৯৬ সালে আমি আবার যাই। সেবার সেখানে তেমন থাকা হয়নি। ১৯৯৮ ও ২০০০ সালের ভ্রমণ আমার জন্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বৃটেনে Uk Islamic Foundation নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। বিশ্বের যে কয়টি প্রধান ইসলামিক প্রতিষ্ঠান বা সেন্টার আছে এটা তার মধ্যে অন্যতম। এটি সম্ভবত বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মূল পরিকল্পনাকারী হচ্ছেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ। তিনি এক সময় পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম নেতা এবং বিশ্বের প্রথম সারির একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে। এই ফাউন্ডেশন প্রথমে লেস্টার শহরে ছিল। পরবর্তীতে সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে মার্কফিল্ড নামক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। এর পরিবেশ খুব সুন্দর। বহু বিঘা জমির উপরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে এরকম সৌন্দর্য কল্পনাই করা যায় না। ইউকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ। পরবর্তীকালে এর মহাপরিচালক হন আমারই আরেক বন্ধু এবং মুরব্বী খুররম জাহ মুরাদ সাহেব। তিনি কয়েক বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পাকিস্তান পড়াশুনা করার পর মিনিসোটা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এমএস করেন। তিনি ছাত্র অবস্থা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ইসলামী সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর নেতা ছিলেন। খুররম জাহ মুরাদের পর বর্তমান ডাইরেক্টর জেনারেল হলেন মানাজির আহসান। তিনি আমাদের রাজশাহীর ছেলে। বৃটেনে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আছেন।

লেস্টারে একটি সপ্তাহব্যাপী ওয়ার্কশপে অংশ নেয়ার জন্য ড. মানজির আহসানের আমন্ত্রণ পাই। সেই ওয়ার্কশপ অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের উপর ছিল। আমাকে একটি বিষয় দেয়া হয়। আমার বিষয় ছিল Can Islamic Economy Solve the Financial Crisis? অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি কি ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস দূর করতে পারে? গত কয়েক বছর ধরে তারা ওয়ার্কশপ নিয়মিতই করে আসছেন। তারই একটা বার্ষিক প্রোগ্রাম ছিল ১৯৯৮ সালেরটি। আমাকে ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরোর চেয়ারম্যান হিসাবেই দাওয়াত দেয়া হয়। ইসলামী ব্যাংক সে অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য যাওয়া-আসার টিকেট দেয়। বাকি খরচ লেস্টারের কর্তৃপক্ষই বহন করেছে। সেই সাথে আমার বন্ধুরা যারা লন্ডনে আছে তারা অনুষ্ঠানের অন্যান্য দিকগুলো সহযোগিতা করেছিল।

সেমিনার পেপার তৈরি করা সত্যিই খুব কষ্টসাধ্য ছিল। এই বিষয়টি নির্বাচনের কারণ ছিল। তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিরাট আকারে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। যার ফলে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক আকারে সংকট দেখা দেয়। সেই সময় তাদের অর্থনীতিতে এমন ধ্বস নামে তাতে তাদের মুদ্রামান বিপুলভাবে হ্রাস পায়। তাদের বেকার সংখ্যা বেড়ে যায়, জিডিপি কমে যায়। একই সময় ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বের অন্যান্য কিছু স্থানেও অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। ঐ সব সংকটের আলোকেই আমাকে বিষয়টি আলোচনা করতে বলা হয়, যেহেতু এককালে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর ছিলাম।

আমি লেখাটি লিখব বলে সম্মত হই। মনে করলাম, লিখা খুব সহজ হবে। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলাম আমি কিছুই লিখতে পারছি না। আমার স্মরণ আছে, এই বিষয়টি লেখার জন্য আমি পুরো ছয় মাস ব্যয় করি। বিভিন্ন আলেমদের সাথে আলাপ করি। অবাক হয়ে গেলাম, কোনো আলেমই ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসই বোঝেন না। তাদের সাথে Inflation, Devaluation, Monitory policy, Monitory crisis প্রভৃতি নিয়ে আলাপ করতে চাই। আমার বন্ধু-

বান্ধব আলেমদের সাথে আলাপ করে দেখলাম তারা আমাকে কোনো দিক নির্দেশনা দিতে পারছেন না। তারা দিবেনই বা কিভাবে, তারা যে এসব সম্পর্কে কিছুই বোঝেন না। কেন অর্থনীতিতে ধ্বস নামে সে জিনিসগুলোই জানেন না। এর থেকে আমি চিন্তা করলাম, আধুনিক বিশ্বকে আলেমরা নেতৃত্ব দেবেন কিভাবে যদি তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় সংশোধন না আনেন। বিশেষ করে, অর্থনীতিকে যদি তারা তাদের মাদরাসা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত না করেন। তাহলে কি করে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হবে? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকের অফিসারদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করলাম। আমি কতগুলো বিষয় বোঝার জন্য যাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম তার মধ্যে একজন হলেন জনাব নজরুল হুদার। তিনি আমার সঙ্গে কাজ করতেন, পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হয়েছিলেন। একজন হলেন, আমার এক বন্ধু ড. কুকসন। আমি তার সাথেও আলাপ করি। সবার সাথে আলাপ আলোচনার উপর ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত আমি নিজের আইডিয়ার আলোকে একটা পেপার খাড়া করি। লেখাটি সেখানে পড়ি এবং তা দেশে রিসার্চ ব্যুরোর ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। আসলে কাজটা আমার জন্য বেশ কঠিনই ছিল। প্রথমে যতটা সহজ বলে মনে করেছিলাম ততটা সহজ ছিল না।

সেপ্টেম্বর মাসের লন্ডনে পৌছেছিলাম। ড. বারী আমাকে রিসিভ করলেন। তিনি সেখানে কিছু প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলেন। সেগুলোতে শরিক হই। লেস্টার থেকে আমাকে সেখানকার আয়োজকদের লোকজন নিতে আসলেন। তারা পথে পাকিস্তান জামায়াতের আমীর কাজি হোসাইন আহমদের ছেলে ড. কাজি লোকমানকেও এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে। ড. লোকমানের সাথে পথে আমার অনেক কথা হলো। তিনি পাকিস্তান থেকে নয় অন্য কোথাও থেকে এসেছিলেন। তার সাথে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থাসহ অন্যান্য বিষয় ও মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হয়। লেস্টারের অনুষ্ঠান ছিল তিন দিনব্যাপী। আমি একটি সেশনের চেয়ারম্যান ছিলাম। সেখানে পেপার পড়লেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ। আমি যে সেশনে পেপার পড়লাম তার চেয়ারম্যান ছিলেন ড. ওমর চাপড়া। সেখানে ড. ওমর চাপড়া, ড. তরিকুল্লাহ খান, ড. মুনওয়ার ইকবাল সহ আরো অনেকের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল। আমন্ত্রিতরা ছিলেন দশ-বারোটি দেশের প্রায় ত্রিশজনের মতো। যারা সবাই ব্যাংকিং বা ফাইন্যান্সের সাথে জড়িত। খুব উন্নত পর্যায়ের প্রোগ্রাম ছিল সেটা। আমার সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন ইসলামী ব্যাংকের জনাব তাজুল ইসলাম সাহেব।

সেখানে ড. ওমর চাপড়া ও প্রফেসর খুরশীদ আহমদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রফেসর খুরশীদ আহমদের সাথে আলোচনার সময় ড. মানাজির আহসান সঙ্গে ছিলেন। সেখানে আমি কতগুলো কথা বলি। বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলো তাদের সামনে তুলে ধরি। প্রফেসর খুরশীদ আমহদ গুরুত্ব দিয়েই সেসব বিষয়ের সাথে একমত হন এবং বলেন এ পথেই আমাদের কাজ করতে হবে। তার সাথে জেন্ডার ইস্যু নিয়ে কথা বলি। মেয়েদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া জরুরী। সেটা ইসলামের জন্য কল্যাণকর হবে। ইসলামেই সে সুযোগ আছে মেয়েদেরকে তাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে তাকে বলি আমাদের পূর্ববর্তী কোনো কোনো নেতা যেসব বই লিখে গেছেন তার মধ্যে জেন্ডার ইস্যুকে সবক্ষেত্রে তারা যথাযথভাবে বুঝতে পারেননি বলে আমার মনে হয়। তিনি আমার কথা বুঝতে পারেন। তাকে বললাম, তাদের লেখায় যেসব বিষয় বাদ আছে তার সমালোচনা না করে দরকার সেসব বিষয়ে নতুন বই লিখে ফেলা। তিনি বললেন, এ কাজটি করতে হবে এবং আমি করছি। তিনি জানালেন, খুররম জাহ মুরাদ সাহেব জীবিত থাকাবস্থায় সেই কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি সেটা করে যাবেন।

তখনও ১১ সেপ্টেম্বর ঘটেনি। তবু আমি বলেছিলাম, আমাদের জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য পরিষ্কার করতে হবে। সেখানে এক্সট্রিমিজমের কথা বলেছিলাম। এর বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে বলেছিলাম। বিশ্বব্যাপী এটা একটা সমস্যা। বোধহয় একথাও বলেছিলাম, ইজতিহাদকে এগিয়ে নিতে হবে। যারা যোগ্য তারাই ইজতিহাদ করবেন। এছাড়া কোনো সমাধান নাই। আমি মনে করি, এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তাই সেগুলোকে তার সামনে তুলে ধরেছিলাম। আমার মনে পড়ে, ১৯৯৬ সালে আমি যখন পাকিস্তানের মনসুরাতে জামায়াতে ইসলামীর হেড কোয়ার্টারে যাই তখনও কাজী হোসাইন আহমদের কাছে একথাগুলো তুলে ধরেছিলাম।

ইউকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি সুন্দর লাইব্রেরি আছে। তাদের থাকা, খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থা আছে। সেখানে সিস্টেমই এমন যে সবাই ফজরের নামাজে উপস্থিত হয়। সেখানে আমি কয়েক ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করি। সবাই কোনো না কোনো ওয়াক্তের নামাজে ইমামতি করে। সেখানে নাইজেরিয়ান এক স্কলারের সাথে আমার

দেখা হয়, তাকে খুবই উচ্চ পর্যায়ের স্কলার বলে মনে হয়েছিল। আলজেরিয়ান একজন অর্থনীতিবীদের সাথে দেখা হয়, তাকে খুব সিনসিয়ার ইকোনোমিস্ট বলে মনে হয়েছিল।

আমার এক ছাত্র হাসান শহীদ থাকতো শেফিল্ডে। বর্তমানে ডক্টরেট করে ফেলেছে। তখন সবে মাত্র শেফিল্ডে পিএইচডির জন্য আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপলাইড ফিজিক্সের লেকচারার ছিল। আমি লন্ডনে যাওয়ার আগে তাকে জানালে সে বলল, আপনাকে শেফিল্ডে আসতে হবে এবং শেফিল্ড ইসলামিক সেন্টারের মসজিদে বক্তৃতা দিতে হবে। আরো বলল, আমাকে সেখানে জীবনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা দিতে হবে। আমি একটু খাবড়ে গেলাম। আমার প্রিয় ছাত্রের আশা আমাকে এমন এক বক্তৃতা দিতে হবে যেটা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ হতে হবে। ফলে বিষয়টি আমার মনে ছিল।

শেফিল্ডে পৌছানোর আগে যখন লন্ডন গেলাম সেখানেই আমি একটা বক্তৃতার খসড়া করে ফেললাম। How to build a strong Muslim Ummah - এই ধরনের একটা বক্তৃতা দেব বলে খসড়াটি ইমেল করে পাঠিয়ে দিলাম আগেই। আর এটা ঠিক হলো যে, সে লেস্টারে এসে সে আমাকে নিয়ে যাবে। সেইভাবে আমার যেদিন প্রোগ্রাম শেষ হলো হাসান শহীদ সেদিন লেস্টারে চলে আসে। লেস্টার থেকে ট্রেনে করে শোফিল্ড গেলাম। সেটা ছিল প্রায় দু'শো মাইল আর দু'তিন ঘন্টার রাস্তার জার্নি। সেটাই আমার বৃটিশ রেলওয়ের প্রথম ভ্রমণ। হাসান শহীদ একটি মসজিদের দোতালায় একটি রুম নিয়ে থাকত। তখনও সে বিয়ে করেনি। ইউরোপের অনেক মসজিদেই মসজিদকে আবাদ রাখার জন্য কিছু রুম তৈরি করে নেয়া হয়। এতে মসজিদের ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়। আমরা সেখানেই উঠলাম। আমার সাথে তাজুল ইসলাম থাকায় রাতে সে এবং হাসান শহীদ নিচে এবং আমি উপরে থাকলাম। হাসান শহীদই রান্না করে খাওয়ালো। সেখানে দুই রাত থাকলাম। প্রথম দিন সে তার ইউনিভার্সিটি দেখাতে আমাদেরকে নিয়ে যায়। শেফিল্ডও ঘুরে দেখলাম। এই ঘোরাঘুরির মধ্যেই সে ও তার এক বন্ধু আমাদের সাথে ছিল। দু'জনে শেফিল্ডের কমিউনিটির জন্যে কি করা যায় তার একটা পরিকল্পনা করে নেই। সন্ধ্যার পর আমি আমার বক্তৃতাটি দিলাম। এর পর প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল। সেই বক্তৃতার লিখিতরূপ এখন ইন্টারনেটেও (www.witness-pioneer.org) পাওয়া যায়। সেই বক্তৃতায় আমি মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তার কথা বলেছিলাম। পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সংকট ও চ্যালেঞ্জটা কি এবং সেই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা ও তার চ্যালেঞ্জটা কি সেই বিষয়ে বলেছিলাম। আমাদের যে আবার সামরিক শক্তি গড়ে তোলা দরকার, শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা দরকার, অর্থনীতিকে গড়ে তোলা দরকার, পশ্চাৎপদতা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার সেসব বিষয়ে আমি সেখানে আমার মতামত ব্যক্ত করি। সেই সাথে জেন্ডার ইস্যুর বিষয়ে নারীদের সম্মান ও গুরুত্ব দেয়ার কথাও আলোচনা করি।

সেখানে কিছু ছাত্রের সাথে আমার যোগাযোগ হলো। তাদেরকে আমি সাধ্যমতো বোঝাবার চেষ্ঠা করি। তখনকার যে পরিস্থিতি তার আলোকে কিছু প্রশ্ন ছিল। শিয়া-সুন্নীর বিরোধকে বড় করে দেখার বিষয়ে আমি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলাম, এটা একেবারেই মারাত্মক। সেটা পাকিস্তান থেকে শুরু হয়ে সারা বিশ্বে ছড়াচ্ছিল। তবে আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ ২০০২ সালে এসে এই বিরোধ অনেক কমে আসে। যেমন পাকিস্তান যে চারটি দল যৌথভাবে তাদের বিগত নির্বাচনে জিতল আর মধ্যে একটি হচ্ছে শিয়া গ্রুপ আর বাকি তিনটি সুন্নী গ্রুপ। আলহামদুলিল্লাহ, এটাও একটা বড় ব্যাপার। তখন তাদের আমি সেই পরিস্থিতির আলোকে বলার চেষ্টা করলাম। তখনও আমি, গণতন্ত্র দিয়ে কিছু হবে না, অস্ত্র নিতে হবে - এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করলাম। এর প্রেক্ষিতে আমি খুব বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, এটা একেবারেই মারাত্মক পথ। এটা ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদ এক জিনিস নয়। সন্ত্রাস কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। গণতন্ত্রাত্রিক পদ্ধতি একটি ইসলামিক পদ্ধতি। জনগণের পছন্দের সরকার - এটা ইসলামের কনসেপ্ট। গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করা নয়, এটা আমাদের বুঝতে হবে। ইসলামী দেশে যে গণতন্ত্র হবে সেটা আল্লাহর আইনের অধীনেই হবে। আল্লাহর আইনও মানা হবে গণতান্ত্রিক সরকারও হবে। এটাকেই ইসলামিক গণতন্ত্র বলা হয়। আমি এভাবেই তাদের কাছে ব্যাখ্যা দিলাম। সেখানে উপস্থিত মালয়েশিয়ান ছাত্ররা তাদের দেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল। তারা তাদের সরকারের নীতির সমালোচনা করল। সেগুলোকে আমি মনে করি যথার্থই ছিল। আনোয়ার ইবরাহীমের প্রতি সরকার সুবিচার করেনি। মাহাথির-আনোয়ারের মধ্যে দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তখন তাদের বলেছিলাম, Let us see what happen - বাকি তো আল্লাহর হাতে। এখন তো কিছু করা যাবে না। কিন্তু ultimately Anwar will be victorious and Anwar will one day be the Prime

Minister of Malaysia - আজকে তাদের অবস্থা যাই হোক না কেন। আসলে ইতিহাসই প্রমাণ করবে কি হবে আর কি হবে না। এগুলো তো কারোর হাতে নয়।

শেফিল্ড থেকে আমি আর তাজুল ইসলাম বাসে করে লন্ডনে ফিরে আসলাম। পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো হাফেজ মুনিরউদ্দিন আমাদেরকে তার বাসায় নিয়ে গেল। সেখানে কয়েক ঘন্টা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

আটানব্বইয়ের পর ২০০১ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (আইডিবি) সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে এবং ফিরে আসার পথে আবার লন্ডন গেলাম। আমি দু'টি আইডিবি কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। একটি লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ২০০০ সনে এবং অন্যটি ২০০১ সনে আলজিয়ার্সে। এগুলো ছিল আইডিবির বার্ষিক সম্মেলন। এখানে আইডিবির গভর্নরসরা শরিক হন। আইডিবির গভর্নসরা হচ্ছেন বিভিন্ন মুসলিম দেশের ফাইন্যান্স মিনিস্টাররা। আর তাদের নাম্বার টু হচ্ছেন সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নররা।

লেবাননে তিনটি এলাকা। সাউথ হচ্ছে শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত জায়গা। নর্থ সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। সমুদ্র তীরবর্তী মধ্যবর্তী এলাকা প্রধানত মিশ্রিত জনসংখ্যা। তবে খৃস্টান বেশি। লেবাননে যতটুকু বুঝলাম একটি ইসলামী জাগরণ সেখানে হচ্ছে, সাউথ এবং নর্থ দুইখানেই। কিন্তু মধ্যবর্তী অঞ্চলে আধুনিকতার সয়লাব এবং পাশ্চাত্যেরই প্রভাব লক্ষ্য করলাম। এখানকার ভবিষ্যত যাই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে দেখা হয় লেবাননে ক্রমেই ইসলামের প্রতি সচেতনতা বাড়ছে। আমি সেখানেও বিভিন্ন ডেলিগেটদের মধ্যে আমার নিয়ে যাওয়া বইগুলি বিতরণ করি। কনফারেন্সে আমরা মূলত অবজারভারই ছিলাম। বেশি অংশগ্রহণের সুযোগও নেই। পরের বছর যখন আলজেরিয়া গেলাম সেখানেও একই রকম। কনফারেন্সের নিয়ম হলো প্রথমে একটা বিরাট রিপোর্ট পড়া হয়। সেটা উপস্থাপন করেন আইডিবির প্রেসিডেন্ট। রিপোর্টের উপর আলোচনা হয়। এর পর নির্বাচন হয়। নতুন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। তারপর পরবর্তী কনফারেন্সের স্থান ঠিক করা হয়। ব্যাংকের হিসাব নিকাশ পেশ করা হয়। একই সাথে একটা অনুষ্ঠানে আইডিবি প্রাইজ দেয়া হয়। আরেকটি সেমিনার হয় উচ্চ পর্যায়ের। সেখানেও আলোচনা হয়। আলজেরিয়ার সেমিনার পেপার পড়েছিলেন বিজে হাবিবি, ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। পেপারটি ছিল মুসলিম বিশ্বের প্রডাক্টিভিটির উপর। পেপারটি খুব উন্নত ও সুন্দর ছিল। এর সমস্যা এবং করণীয় বিষয়গুলে ছিল তার মধ্যে। আইডিবি কনফারেন্সের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কনফারেন্স হয়। সেখানে ইসলামী ব্যাংক নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটা আলাদা সংগঠন আছে। তেমনি অডিটিং এন্ড একাউন্টিংয়ের জন্য আলাদা সংগঠন আছে। সেখান তাদেরও আলাদা সম্মেলন হয় এবং তারা তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান নেয়। এইগুলো একই সময়ে চলতে থাকে।

বৈরুতে সম্মেলনে অতটা না বুঝলেও আলজিয়ার্স সম্মেলনে বুঝলাম আইডিবি সত্যি খুব শক্তিশালী। ওআইসি যদিও একটা বড় সংগঠন, যদিও তার পলিটিক্যাল সফলতা আমরা খুব বড় কিছু দেখি না, সেটাকে দুর্বল বলেই মনে হয়। আর এর কারণ হলো মুসলিম শাসকরা এটাকে শক্তিশালী করছে না। ওআইসি শক্তিশালী হবে না যদি না মুসলিম সরকারগুলো এটাকে শক্তিশালী না করে। সরকারগুলো কেন তা করছে না - হয়তো কারোর ইশারায়। অন্য কোনো বড় শক্তির প্রভাবে এই দিকে নজর দিচ্ছে না যেটা আমরা ভুল করছি বলে আমি মনে করি। কিন্তু সেই তুলনায় আইডিবি শক্তিশালী এবং তার কাজকর্ম ব্যাপক। বিশেষ করে, আফ্রিকায় তা আরো বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। এশিয়ার দেশগুলোতেও তাদের ভালো কাজ দেখা যায়। কিন্তু যে কোনোভাবেই হোক, বাংলাদেশ হয়তো তার বেনিফিট অতটা পাচ্ছে না যেটা পেতে পারে, আমরা যদি সে রকম খুব উঁচু মানের স্কিম নিয়ে যাই এবং সাবমিট করতে পারি। তাতে না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশ সরকার যদি এটাকে গুরুত্ব দেয় তাহলে কেন পাবে না সেটা আমরা বুঝে আসে না। কারণ রিপোর্টে দেখলাম, প্রত্যেক আফ্রিকান কান্ট্রিতে তাদের প্রায় তিনটা চারটা করে প্রজেক্ট আছে। তাহলে আমাদের দেশে এটা হতে পারবে না কেন? আইডিবি তার ক্যাপিটালও (Capital) বাড়িয়ে নিয়েছে। আমার মনে আছে সেখানে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে, তাদের ফান্ডের কোনো অভাব নেই। আরব বিশ্বের যে কোনো পরিমাণ ফান্ড আমরা পেতে পারি। কিন্তু প্রজেক্ট মূল্যায়ন (Evaluation) করার মতো আমাদের ভালো ব্যবস্থা নেই। এই কথাগুলো আমার যুক্তরাজ্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে এসে গেল।

যাই হোক আলজিরিয়া যাওয়ার পথে আমি ইউকে যাই। সেখানে ড. হাসান শহীদ ও আমার আরেক ছাত্র মাহমুদুল হাসান আমাকে রিসিভ করে। হাসান শহীদের ততদিনে পিএইডি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা ছিল। ঠাণ্ডাও ছিল প্রচুর। যেহেতু আমার ঠাণ্ডার রোগ আছে ফলে তাদের বাসাতেই থাকলাম। গল্পগুজব করে কাটালাম। কোথাও আর বের হইনি। তাদের সঙ্গে আমি ইউকে সহ মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। উইটনেস-পাইওনিয়ারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। সামনে কি করা যতে পারে তাও আলাপ হয়। বিশ্বের বিভিন্নস্থানে টেলিফোনে কথা বলি। পরের দিন তারা আমাকে হিত্রো এয়ারপোর্ট পৌঁছে দিয়ে যায়। সেখান থেকে আমি আলজিয়ার্স যাই। তখন আমার সাথে ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট আবদুর রকীব সাহেব ছিলেন। আলজিয়ার্স যেতেই এয়ারক্রাফটের মধ্যে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করলাম। সেখানে একটা মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ চলছিল। এখনও যেটা আছে সেটা সামরিক আবরণের অধীনে একটি সরকার, দেখে মনে হবে গণতান্ত্রিক সরকার। এয়ারক্রাফটেই লক্ষ্য করলাম পঞ্চাশ ভাগ মেয়েই সেখানে হিজাব পড়া। এরা লন্ডন থেকে যাচ্ছে। যথেষ্ট আধুনিক ধরনের লোক। কিন্তু তাদের মধ্যেই এটা আমি লক্ষ্য করি। আর আলজিয়ার্সে পৌঁছে দেখি সেখানেও একই অবস্থা। আলজিয়ার্সের সম্মেলন শেষ করে আমি প্যারিস গেলাম। আলজেরিয়ার সিকিউরিটি খুব শক্ত।

প্যারিস এয়ারপোর্টের লোকজন ফ্রাঞ্চ ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। ফেরার সময় বৃটিশ এয়ারওয়েজে উঠতে হবে। সেটা পেতে আমাক বেশ কষ্ট করতে হয়। আবার আমি লন্ডনে পৌঁছলাম। এখানে আমাকে মাহমুদের রিসিভ করার কথা। কিন্তু সে তখন এসে পৌঁছায়নি। আমি এয়ারপোর্টের বাইরে একাই বসেছিলাম। মাহমুদ এলে সেখন থেকে তার সাথে সরাসরি লেস্টারে চলে যাই। একদিন একরাত থাকার কথা। মাহমুদ সে সময় পিএইচডি করার জন্য লেস্টার গেছে। এবার লেস্টার যাওয়ার উদ্দেশ্যই হলো তার সাথে দেখা করা এবং থাকা। সেখানে আমার সঙ্গে ড. মুরাদ হফম্যানে সঙ্গে দেখা হলো। এর আগে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল আমি যখন ওয়াশিংটনে Association for Muslim Social Scientist এর সম্মেলনে যোগদানের জন্য ২০০০ সালে যাই তখন। এবার তার সাথে আমার কথাবার্তা হয়। সেখানে আরো অনেক স্কলার ছিলেন, তাদের সাথেও আলাপ আলোচনা হয়।

আমার মনে আছে কিছু স্কলার আমাকে গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি সেখানে নিরপেক্ষভাবে যেটা সঠিক কথা সেটা বলেছিলাম। অকারণে নিন্দা অকারণে প্রশংসা কোনোটাই গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে করিনি। তাদের প্রাপ্যটুকুই আমি বলেছিলাম। বাইরে অবশ্য গ্রামীণ ব্যাংকের একটা ইমেজ আছে। তারা মনে করে গ্রামীণ ব্যাংক সফল। গ্রামীণ ব্যাংকের সম্পর্কে তারা অনেক ভালো শুনেছে। কিন্তু তাদের সত্যিকার অগ্রগতি এবং কোনো প্রকার দোষ আছে কি না তা একেবারেই বাইরের মানুষের জানা নেই। আমি তাদের কাছে তাও তুলে ধরলাম। অর্থাৎ আমি ভালোমন্দ দুই দিকই তাদের বলেছিলাম।

সেখানে আমার অনেক পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলো। এর মধ্যে এসে যোগ দিল হাসান শহীদ। তারপর ঠিক হলো আমি ও হাসান শহীদ একত্রে লন্ডন ফিরে আসব। কিন্তু এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। অথচ দেখা করার কোনো সময়ই করা গেল না। ফলে ঠিক হলো ম্যানচেস্টার যাওয়ার পথে তার সাথে আমার গাড়িতে আলাপ হবে। অর্থাৎ তিনিও ম্যানচেস্টার যাবেন আমিও যাবো। তাই একত্রেই আমরা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুই-তিন ঘন্টার জার্নি হবে এবং সেখান থেকে আমরা ট্রেনে করে লন্ডন চলে আসব। হাসান শহীদকেও যেতে হবে। কিন্তু গাড়িতে স্থান সংকুলান খুব টাইট হয়ে যায়। তবুও তিনজন সেভাবেই গেলাম। পথে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রফেসর খুরশীদ আহমদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাকে আগেও যেগুলো বলেছি তা পুণরায় আবার বলি। সেই সাথে আমার মনে হয় আমি উনাকে বলেছিলাম, আপনার আত্মজীবনী লেখা দরকার। সেটা অত্যন্ত জরুরী। আফগানিস্তান পরিস্থিতি তখন খুবই খারাপ ছিল। তা নিয়ে আমাদের কথা হয়। আফগানিস্তানে হামলা যে কোনো অবস্থাতেই সঠিক নয় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। একই সাথে আমি তুলে ধরি তালেবানরা যা করছে তা ঠিক না। তারা একটা সমস্যা। তারা আধুনিক বিশ্ব বোঝে না। এইসব বিষয় আমি তুলি। খুরশীদ ভাই আমার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে একমত হন আবার কোনো কোনো বিষয়ে বলেন, তোমার আন্ডারস্টান্ডিং ঠিক নয়। এরকমই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সেই সাথে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর ভালোমন্দ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ইতোমধ্যে চারদলীয় জোট সরকার গঠন হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তুমি নতুন সরকারের জামায়াত ইসলামীকে সাহায্য করবে যাতে সরকারে তারা ভালো করতে পারে। তিনি

আমাকে একটা চিঠির কপি দিলেন যেটা তিনি নিজামী সাহেব কে লিখেছিলেন। চিঠিতেই আমি জানতে পারি, তিনি তাতে আমাকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছিলেন, you take his help.

আমাদের আলাপ শেষে ম্যানচেস্টারে তিনি তার গন্তব্যে চলে গেলেন এবং আমরা ট্রেনের টিকিট কেটে লন্ডন আসলাম। টিকেটের সাংঘাতিক দাম। দু'টো টিকিট নিল একশ পাউন্ড। মানে দুশো মাইলের জন্য আটহাজার টাকা প্রায়। সেই দিনই সন্ধ্যার আগে এসে পৌঁছলাম। মাগরিবের পর সেখানকার তরুন ছাত্র নেতৃবৃন্দ একত্রে হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হলো। দেশের নতুন সরকার বলে আমাকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো। কেন তারা শহীদ মিনারে গেল, কেন স্মৃতিসৌধে গেল - এই ধরনের প্রশ্ন। আমি তখন তা. কাদযাভীর 'ফিকাহ অব ব্যালান্সে'র কথা বলেছিলাম। তাদের বুঝিয়েছিলাম, একটা বড় কল্যাণের জন্য যদি ছোটখাট অকল্যাণকে সহ্য করতে হয় তাহলে তা করাই হলো ইসলামের বিধান।

তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার পর আমার মনে হলো বিশ্বব্যাপী যে সমস্যা হচ্ছে তা নিয়ে তরুন সমাজ খুব চিন্তা করছে। কিন্তু কেন জানি তাদের চিন্তার মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। অনেক উদ্ভট ভাবনা রয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক পথে কিছু হবে কি না সেই একই রকম প্রশ্ন। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, ইত্যাদি। তাই আমি তাদেরকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব সাবধানে বলি যে, কোনো কিছু যাদু করে করা যাবে না। শক্ত ও কষ্টসাধ্য শ্রমের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অনেক যোগ্য লোক তৈরি করতে হবে। কোনো আবেগই আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। আবার আমাদের গতানুগতিক পদ্ধতি দ্বারাও চলা যাবে না। একটা সমন্বয় লাগবে ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক চাহিদার মধ্যে। এর একটা সমন্বয় ঘটাতে হবে। এটা ছিল একটা প্রশ্ন উত্তর পর্ব। তার আগে আমি নিজের থেকেই মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে কিছু বলেছি। সে সময় প্রায় দেড় ঘন্ট ধরে লন্ডনের একটা পত্রিকা আমার এক ইন্টারভিউ নেয়। হয়তো তা  প্রকাশিতও হয়েছে। আমি অবশ্য তার কোনো খবর রাখিনি।

সেখানেও আমার সঙ্গে কয়েকজন স্কলারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, আটানব্বইয়ের ঘটনা এখানে আবার বলছি যে, সে সময় রশীদ ঘানুশির সাথে আমার দেখা হয়। তিনি হলেন তিউনিশিয়া ইসলামী আন্দোলনের নেতা। ড. বারী আমাকে তার সাথে দেখা করাতে নিয়ে যান। তাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। তিনি নির্বাসনে আছেন। তাকে কেউ না কেউ হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। এই জন্যই তার এই সাবধানতা। ফলে আমাকে নানারকম রাস্তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তার সাথে খুব সুন্দর আলাপ হলো এবং আমি লক্ষ্য করলাম তিনি খুব বড় মাপের একজন মানুষ এবং বুদ্ধিজীবী। তাকে বলা হয় ইখওয়ানের ইকবাল এবং তাকে ইখওয়ানের সার্কেলে খুব বড় শায়েখ বা চিন্তাবিদ মনে করা হয়। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি আধুনিকতার সঙ্গে সমন্বয়ের কথা বলছেন। তিনি বলছেন, We must accept democracy fully. বহু মতবদাকেও (Pluralism) সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন পার্টি কাজ করবে। আমিও করব অন্যরাও করবে। যদি আমি জিতি আমি ক্ষমতায় যাবো আর আমি হারলে ক্ষমতা থেকে চলে যাবো - এটা আমাদেরকে মানতে হবে। না মানলে পশ্চিমারা আমাদের ভুল বুঝবে আর তারা ভুল বুঝলে তা ইসলামের জন্য সমস্যা হবে। তাই তিনি গণতন্ত্র, প্লুরালিজম, হিউম্যান রাইটস সহ নারীদের কথা বলছেন। সেই সব কারণেই তাকে বলা হয় আজকের যুগের ইকবাল।

এবার যেহেতু সময় কম ছিল বলে হাশিম ফারুকী, একজন পলিটিক্যাল সাইন্টিস্ট আজজাম তামিমী এবং রশীদ ঘানুশী আমরা একত্রিত হলাম আলাপ করার জন্য ইম্প্যাক্টের অফিসে। সেখানে আমার সঙ্গে ছিল হাসান শহীদ ও মাহমুদ। প্রথমে ইম্প্যাক্ট সম্পাদক হাশিম ফারুকীর সঙ্গে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হয়। তারপর তরুন যুবক আজজাম তামিমীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্যালেস্টাইন পরিস্থিতিসহ মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার আলাপ হয়। এর মধ্যে  রশীদ ঘানুশী ষাট-সত্তর মাইল ড্রাইভ করে চলে আসেন। আমরা আবার সকলে মিলে একত্রে আলাপ করি। মতামত বিনিময় করি। রশীদ ঘানুশীকে আবার সেই আগের কথাই বলি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলি। আজ হোক কাল হোক আমাদেও ডিক্টেটরশিপে অবসান করতে হবে । মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এসব বিষয়ই আমাদের মধ্যে আলাপ হয় এবং আমরা মোটামুটিভাবে এইসব বিষয়ে একমত হই এবং এটাও একমত হই যে, শিক্ষাকে আমাদের সংস্কার করতে হবে। পুরানো যে সমস্ত কোর্স স্কুল বা মাদরাসাগুলোতে আছে সেটা আজকের প্রয়োজন পূরণ করছে না। এসব বিষয় নিয়েও একমত হই।

এটা আমার জন্য একটা বিরাট সম্মান যে, এত বড় বড় মেজর স্কলাররা শুধু আমার অনুরোধে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে চলে আসেন।